শুকতারা

দশম বর্ষ
নবম সংখ্যা
কার্তিক ১৩৬৪

দেব সাহিত্য কুটীর

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপিঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"শুকতারা" পড়ো যে সব ভাইবোনেরা—

কাগজ

যে কত দামী তা' তোমরা জানো। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভোজ এই কাগজের পাতায় ক'রে পরিবেশন ক'রেছেন বিশ্বের জ্ঞানী গুণীরা তোমাদের কাছে। এই কাগজের সম্মান তোমরাই রাখবে—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা, অর্থাৎ লেখাপড়ায়।

●

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, লেখন সামগ্রী
ইত্যাদি বিক্রেতা

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"—৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

●

—শাখা—

কলিকাতার সর্ব্বত্র, উত্তর প্রদেশ ও আসাম

ফোন—২২-৪৯৯১ পোঃ বক্স—৭৬২ তার—"নোটপেপার"

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).
(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950).

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৬৪

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	চামুণ্ডা (চিত্র-পরিচয়)	বিমলচন্দ্র ঘোষ	মুখপত্র
২	·নার বচন (কবিতা)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৬২৫
৩।	·এক চড় (গল্প)	আশাপূর্ণা দেবী	৬২৭
৪।	পথ ভুল (গল্প)	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৬৩৩
৫।	দেশলাইওয়ালী (অনুবাদ)	শ্রীদেবব্রত ঘোষ	৬৪০
৬	টারজানের ত্রিংশ অ্যাড্‌ভেঞ্চার	সব্যসাচী	৬৪৪
৭।	জনক রাজার সভায় যাজ্ঞবল্ক্য (পৌরাণিক গল্প)	অমরনাথ রায়	৬৫১
৮।	সেকালের নরবলি (ঐতিহাসিক-কাহিনী)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৬৫৪
৯।	রাজভক্তির প্রতিযেগিতা (অনুবাদ)	শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র	৬৫৭
১০।	ইস্কাবনের টেক্কা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৬৬০
১১।	ব্যোম্‌ ভোলানাথ (জীবনী)	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬৬
১২।	হাতী শিকার (শীকার-কাহিনী)	শ্রীসুজিৎ বাগচি	৬৬৯
১৩।	ভারতের রত্ন (জীবনী)	অলককুমার ঘোষ	৬৭৩
১৪।	ভয় কিসের (খেলাধুলা)	মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার	৬৮১
১৫।	সাধনার জয় (জীবনী)	রবিদাস সাহা রায়	৬৮৫
১৬।	জন্মদিনের উপহার (গল্প)	কুমারী হাসিরাণী নন্দ	৬৮৮
১৭।	সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)		৬৯১
১৮।	জীবন-চিত্র (রবার্ট ফুলটন)		৬৯২
১৯।	সোনার ভারত (চিত্রে ইতিহাস)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৬৯৫
২০।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)		৬৯৮
২১।	দাদুমণির চিঠি		৭০০

পাদপূরণ

জেনে রাখা ভালো — ৬২৬, ৬৪৩, ৬৫৬, ৬৫৯, ৬৬৫, ৬৭২, ৬৮০, ৬৮৪, ৬৮৭

পাদপূরণ

অমর বাণী — এ. ই. কোপার্ড — ৬৩২

Just Out ! Just Out !! Just Out !!!

MODEL QUESTIONS ON MATHEMATICS (Comp.)

(WITH SOLUTION)

BY

Hari Das Bagchi, M.A., (P.R.S.), Ph.D., F.N.A.Sc.

(Retired) ***Hardinge Professor of Higher Mathematics Calcutta University.***

—Most suitable book for classes IX and X. Students must each purchase a copy.

To secure very high marks.
(Price Rs. 2-8-0 only)
(By Post—Rs. 3-4-0 only)

To be had of :—

N. Banerjee & Sons.
PUBLISHERS & BOOK-SELLERS
195/2, CORNWALLIS ST. CAL.-6

&

Bani Lekha Press
7B, RAM MOHON SAHA LANE,
CALCUTTA—6

=শিশু উপন্যাস=

দুই ভাই	১৷৷০
ঘূর্ণিপাকে	১৷০
হাসি কান্না	১৲
পথের বন্ধু	১৲
হারানো দিন	১৷০
প্রলয়ের পর	১৲
ছোটদের গল্প	১৲

=টার্জান সিরিজ=

অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব টার্জান	১৲
টার্জান এণ্ড হিজ মেট	১৲
টার্জান দি এপ্‌ম্যান	১৷০
টার্জান ইন দি জাঙ্গল	১৷০
টার্জান দি গ্রেট	১৷০
টার্জান অন দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড	১৷৷০

সান অব্ কং—১৷০

কিং কঙ্—১৷০

=রোমাঞ্চকর গল্প=

ভয়ঙ্কর	১৲
রাক্ষুসে আফ্রিকা	১৲
রোমাঞ্চকর কাহিনী	১৲
বোমার ভয়ে বর্মা ত্যাগ	১৲
উড়োজাহাজে কয়েদী	১৲
ঝড়ের কালো মেঘ	১৲

=বীরেন দাশ=

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী

ছায়াচিত্রে অভিনীত ও ছায়াচিত্রের চিত্র-সমেত······২৲ টাকা

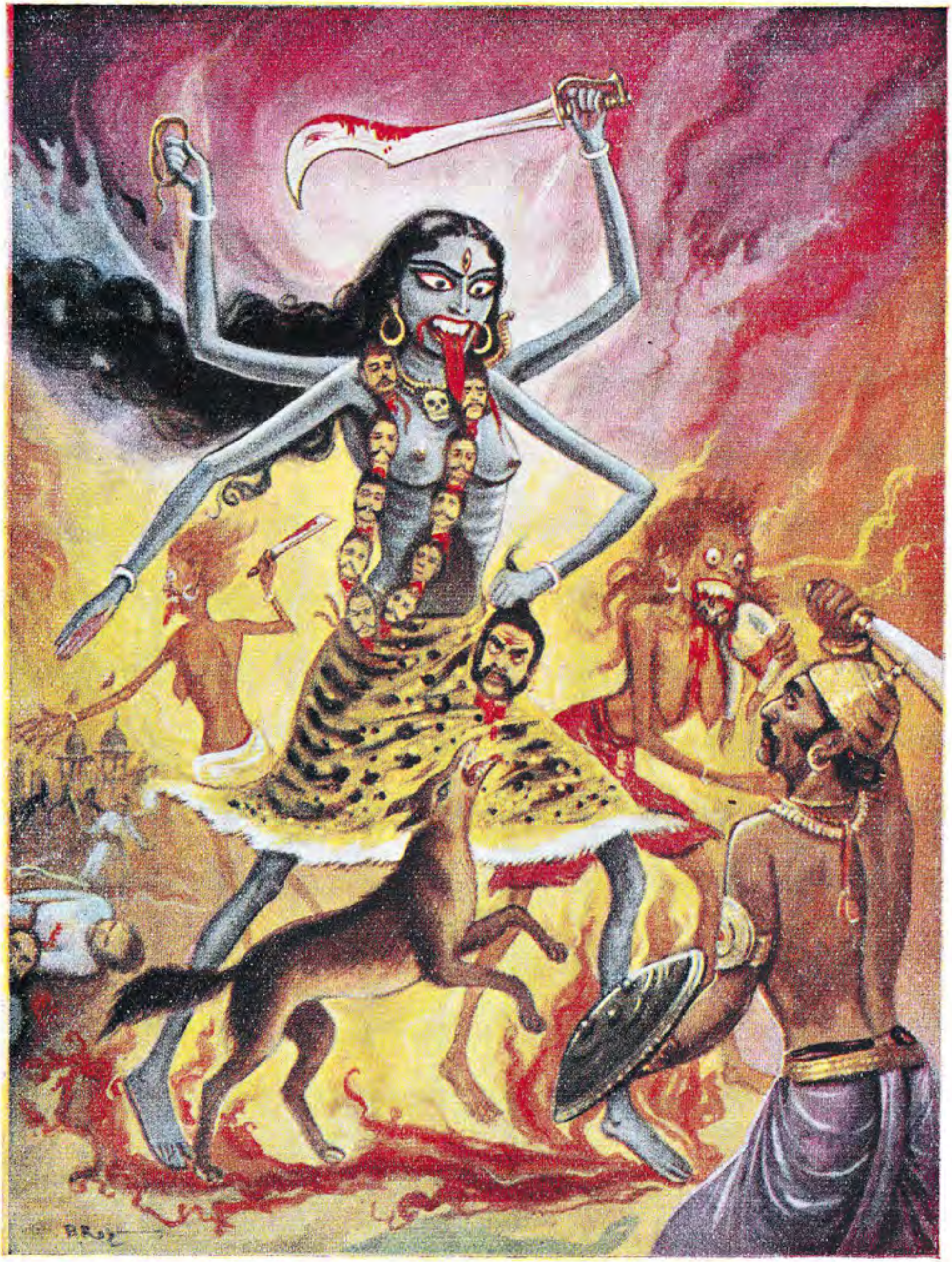

চামুণ্ডা

চামুণ্ডা

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

তাতা থৈ থৈ চামুণ্ডা নাচে
ভ্রূক্ষেপ নেই কে মরে কে বাঁচে ॥
দানবদলনী নাচে মহাকালী
প্রলয়বহ্নি মহাকাশে জ্বালি' ॥
পাগলিনী হাঁকে "ম্যায় ভুখা হুঁ !"
কেঁদে ওঠে শিবা হুক্কা-হ্যা-হু ॥
মুণ্ডমালিনী অজিনবসনা
নাচে ত্রিনয়নী লোলরসনা ॥
চারি ভুজ তুলে প্রলয়ংকরী
তাথিয়া তাথিয়া নাচে শংকরী ॥

যখনি ধরণী পাপে ভরে যায়
আসে অবিচার আসে অন্যায় ॥
দানবের হাতে মরে মানবতা
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে স্বর্গে দেবতা ॥
দুর্ব্বল মরে সবলের হাতে
শঠতা মূঢ়তা আসে অমারাতে ॥
তখনি জননী জগত ধাত্রী
নাশিয়া তামসতিমির রাত্রি ॥
চামুণ্ডারূপে খড়্গধারিণী
আসেন সর্ব্বকলুষহারিণী ॥
ভক্ত জ্বালায় আঁধারে দীপালি
ওঁ হ্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালী ॥

দশম বর্ষ • নবম সংখ্যা • ১৩৬৪, কার্ত্তিক

খনার বচন

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

মরতে গেলেও বাঁচতে হবে
পড়তে গেলেও উড়তে।
পিছনে তীর টেনেই তবে
সামনে পারো ছুড়তে!

দুনিয়াখানাই উল্টো!
সোজা কথা শোনাও যদি
বুঝবে সবাই ভুল ত'।

বাক্য কিছু হোক্ না বাঁকা
মন শুধু থাক সিধে।
কষে কথা প্যাঁচাও, যদি
মর্ম্মে না যায় বিঁধে।

তিলকে যত তাল করো না,
দিনকে করো রাত !
মুখের তোড়ে হয় যদি ত'
হোক্ না বাজি মাৎ।

তালটা শুধু সামলান চাই
হোয়ো না রাত-কাণা।
নইলে পড়ে বেঘোরে শেষ
বুঝবে ঠেলা খানা।

ঘনার বচন শোনো,
সোজা হিসেব পেতে হ'লে
উল্টো করে' গোনো।

● জেনে রাখা ভালো

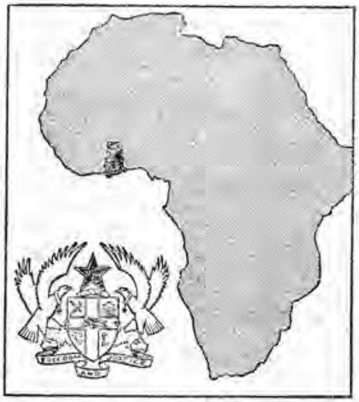

১নং চিত্র। যন্ত্র সভ্যতার কল্যাণে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের অধিবাসীদের বর্তমানে এখান ওখানে যাওয়া আসা করতে হলে উন্মুক্ত আকাশের তলায় আসবার প্রয়োজন নেই। হোটেলে থাকা, রেস্তোরায় খাওয়া, দোকানে জিনিসপত্র কেনা ও অফিসে চাকরি—সবই মাটির নীচের রেল পথের সাহায্যে বজায় রাখা যায়।

২নং চিত্র। অশ্বেতকায়দের শ্বেতকায় জাতিরা চিরকাল পায়ের তলায় রাখবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। আজ অবশ্য তাদের মুক্তি-দাবী শ্বেতকায়রা অস্বীকার করতে পারছে না। ফলে এসিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি এক এক করে স্বাধীন হচ্ছে। এ বছরেই আফ্রিকার গোল্ড কোষ্ট স্বাধীন হয়েছে। তার বর্তমান নাম ঘানা।

৩নং চিত্র। মাছেদের মধ্যে যদি রেস হয় তাহলে, বৈজ্ঞানিকদের মতে সেলফিস্ জিতবে। কারণ, তার মত দ্রুত সাঁতারু মাছ সাগরে নেই। সেলফিস্ তিন সেকেণ্ডে ১০০ গজ সাঁতার দেয়! এই হিসাবে সে প্রায় ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে ছোটে।

এক চড়

—আশাপূর্ণা দেবী

ডাবরের মতো মুখ, ঘটের মতো পেট, থোড়ের মতো হাত পা, বুরুশ-কুচির মতো চুল আর সবটা মিলিয়ে একটি আস্ত বিলিতি কুমড়োর মতো চেহারা!

নীল হাফ্‌প্যাণ্ট আর গোলাপী হাফ্‌সার্ট পরে এসে দাঁড়ালো! না, শুধু 'দাঁড়ালো' বললে ভুল হবে—এসেই বাড়ীসুদ্ধু সক্কলকে ঘটাঘট্ প্রণাম করতে সুরু করলো। যতো বলা হচ্ছে 'থাক্ থাক্', কে কার কথা শোনে। শেষ পর্য্যন্ত ভয়ানক একটা হাসির রোল ওঠায় তবে থামা দিলো। বোধ হয় এতোক্ষণে মাথায় ঢুকলো একটা কিছু ভুল করে ফেলেছে।

আমাদের এদিকে ছিপিখোলা সোডার বোতলের সোডার মতো হাসি বাগ মানছে না। হরিদাস আমাদের চাকর বনমালীকে সুদ্ধু প্রণাম করে মরেছে! এতে বাপু কে হাসি চেপে রাখতে পারে? বনমালী তো কাসতেই সুরু করে দিয়েছে।

অবিশ্যি মানলাম বনমালীকে চাকর বলে বোঝা মফস্বলের ছেলের কর্ম্ম নয়, কারণ বনমালী তার গেঞ্জি পর্য্যন্ত স্টীম লণ্ড্রীতে কাচিয়ে নেয়। তবু—আমরা তো হাসবোই!

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওর নামকরণ করে ফেললাম ভক্ত হরিদাস!

বনমালী তো কাসতেই সুরু করে দিয়েছে

রাসু অমায়িক মুখে বলে, "হ্যাঁ ভাই ভক্ত হরিদাস, তোমাদের দেশে ঝাড়ুদার-টাড়ুদারদেরও প্রণাম করতে হয়?"

হরিদাস অবাক মুখে বলে, "ঝাড়ুদার? কই না তো!"

আমরা আর একবার সরবে হেসে উঠি।

এরপর মেজখুড়িমা ওকে জলখাবার-ছুতোয় উদ্ধার করে নিয়ে যান। কারণ হরিদাস মেজখুড়িমারই দূর সম্পর্কের বোনপো। মেদিনীপুর জেলার কোন গ্রাম থেকে যেন স্কুল-ফাইন্যাল দিয়ে কলকাতায় কলেজে পড়বার আশায় এসেছে। এখানেই থাকবার বাসনা।

শুনে রাস্থ, নস্থ আর আমি 'হুররে' করে উঠলাম।

আহা, উঠতে বসতে হাতের কাছে ক্ষ্যাপানোর উপযুক্ত এমন একখানি চীজ্ অনেক পুণ্যফলে মেলে!

প্রথম আলাপ-আলোচনার ধরণটা এই—

"হ্যাঁ হে হরিদাস, তোমাদের স্কুলের নামটা কি?"

"মাকড়তলা হাই স্কুল!"

বলা বাহুল্য আগেই শুনেছি, তবু চোখ কপালে তুলে বলি, "ওঃ তাই!"

"তাই মানে?" হরিদাস আশ্চর্য্যান্বিত।

আমি উদাসীনের অবতার হয়ে বলি—"না, মানে স্কুলটা যখন মাকড়তলা, তখন তার ছাত্রদের একটু মাকড়া মাকড়া বুদ্ধিতো হবেই।"

আমাদের সঙ্গে বনমালীও হাসে—"হি হি হি, আমাদের হরিদাসবাবু না কি কলকেতার কলেজে পড়বে?"

আমি গম্ভীরভাবে বলি, "দূর পাগলা, কলকাতার কলেজে পড়বে কি? ওকে পড়াবার উপযুক্ত প্রফেসর কি আর এদেশে আছে? ও সোজাসুজি বিলেতেই চলে যাবে!"

হরিদাস তার কুমড়োর মতো ভার ভারীকি চেহারাটি নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে, "বিলেত যাবার অবস্থা থাকলে তো যেতামই, বাবার সামান্য আয়, কি করে হবে বলো ভাই?"

আমরা আশা করছিলাম হরিদাস আমাদের 'আপনি' বলবে, 'তুমি' বলায় চটলাম। অথচ স্পষ্ট করে বলতেও পারি না, আমরা তিনজন, মানে রাস্থ নস্থ আর আমিও যে এবারে স্কুল ফাইন্যাল দিয়েই বসে আছি। ও যদি আমাদের আপনি আজ্ঞে করে, খামোকা বয়েস বেড়ে যায় আমাদের। অথচ ওই হাফ্প্যান্ট পরা গাঁইয়া ছেলেটা আমাদের তুমি তুমি করবে এও অসহ্য।

বললাম, "হরিদাস তোমার বয়েস কতো ?"

হরিদাস বুরুশ-কুচির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, "চোদ্দ !"

শোনো, শোনো কথা একবার ! ওইতো ভূত একটা, কোন না এক এক ক্লাসে দু'বছর করে জিরিয়েছেন, উনি না কি আবার চোদ্দ বছরে স্কুল ফাইন্যাল সেরে এসেছেন। তা' ছাড়া ওজনে তো আমাদের দু'জনের একজন। বোকা চালিয়াৎ আর কাকে বলে।

মুখ বাঁকিয়ে হাসি আমরা, আর বলি, "সে কি হরিদাস, চোদ্দ ? অতো বয়েস তোমার ? আমরা ভাবছিলাম দশ এগারো !"

হরিদাস তার ইঁটের মতো নীরেট মুখে গরুর মতো চোখ দুটি ড্যাব্‌ডেবিয়ে বলে, "সে কি ভাই, অতো কম কি করে হবে ? দশটা ক্লাস পার হতেই তো দশ বছর লেগে গেছে।"

রাসু বলে, "তাই বুঝি ? আহা ! আমরা ভাবছিলাম তোমার মতো এমন একটা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের কি আর ক্লাস টেনে উঠতে দশ বছর লেগেছে ? ডবল প্রমোশন পেয়ে পেয়ে বোধ হয় পাঁচ বছরেই সেরেছো।"

হাঁদারাম আরো নীরেট মুখে বলে, "হতো হয়তো, কিন্তু আমাদের স্কুলটায় যে আবার ডবল প্রমোশনের নিয়ম নেই !"

আচ্ছা এতো 'গাড্ডু' মানুষে হয় ?

এ ছেলে যে স্কুল ফাইন্যাল পর্য্যন্ত এগিয়েছে কি করে, তাই ভাববার কথা। রাসু বলে, "ভাববার কিছু নেই, মনে রেখো 'মাকড়তলা'।"

মেজদা আবার ওর আর একটি নতুন নামকরণ করেন। বেশ চমকপ্রদ আবিষ্কার। গম্ভীরভাবে ডাকলেন, "ভূষিমাল, ওহে ভূষিমাল, শোনো শোনো।"

হরিদাস হকচকিয়ে বলে, "আমায় কিছু বলছেন ?"

"হ্যাঁ হে বাপু।"

"কিন্তু আমার নাম—মানে আমার নাম হরিদাস।"

"তাতে কি ?" মেজদা মুচকে হাসেন, "অতো শক্ত কথা বাপু আমার মনে থাকে না, তার চাইতে 'ভূষিমাল' অনেক সোজা। আপত্তি আছে তোমার ?"

হরিদাস গম্ভীর মুখে বলে, "আজ্ঞে না, আপত্তি কিসের ? নামেতে কি আসে যায় ? ভূষিমাল বলে যদি আপনি সুখ পান তাই বলবেন।"

মেজদাও গম্ভীর হয়ে বলেন, "রেজাল্ট তো বেরিয়ে এলো, কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হবে ঠিক করেছো ?"

ভূষিমাল লজ্জাবতী কনে বৌয়ের মতো ঘাড় হেঁট করে বলে, "আজ্ঞে ওর আর ঠিক করা করি কি? প্রেসিডেন্সিই তো শুনেছি সব থেকে সেরা কলেজ, ওতেই যাবো।"

মেজদা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলেন, "তা' হলে তো বাপু ভূষিমাল ডাকটা ঠিক হয়নি আমার, বলা উচিত ছিলো সেরামাল! সেরামালই সেরা জায়গায় থাকে।"

মেজদা মুচকে হাসেন……[পৃঃ ৬২৯

হরিদাস আরো লজ্জাবতী!

মেজদা মৃদু হেসে বলেন, "কিন্তু প্রেসিডেন্সির যে আবার একটা বদরোগ আছে হে, মার্ক সীট্ মনের মতো না হলে ভর্ত্তি করে না।"

"আজ্ঞে সে তো জানিই।" বলে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো ভূষিমাল।

"সত্যি ছেলেটা এতো হাঁদা!" উঠতে বসতে সবাই বলে।

না বলে উপায় কি!

না বোঝে ঠাট্টা, না জানে কথা, না পারে মিশতে। একদিন সিনেমা দেখতে যেতে বলা হলো, বললো কিনা, "না ভাই, মার কাছে দিব্যি গেলেছি—কলকেতায় এসে সিনেমা-থিয়েটার দেখবো না।"

আমরা চোখ কপালে তুলে বলি, "কেন বলো তো?"

হরিদাস পরম বিজ্ঞের মতো বলে, "দেখলেই নেশা জন্মাবে, নেশা জন্মালেই উচ্ছন্ন যেতে হবে।"

শুনে রাস্থ রেগে উঠে বলে, "ও তার মানে আমরা সব উচ্ছন্ন যাওয়া ছেলে?"

হরিদাস বিপন্ন ভাবে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "না না সে কি কথা, তা' বলছি না তা' বলছি না।"

ওর বেশী কথা আর জোগায় না ওর।

পায়ে খালি হাঁটতে আর খাটতে।

বাড়ীতে কোনো কাজের কথা শুনেছে, কি হরিদাস একপায়ে খাড়া। তা' সে —রাতদুপুরে বড় জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের মশারি টাঙিয়ে দেওয়াই হোক, আর দুপুর রোদ্দুরে এক মাইল রাস্তা হেঁটে পিসেমশাইয়ের জন্যে ডাব আনাই হোক। ক'দিনের মধ্যেই বাড়ীসুদ্ধু মহিলার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো হরিদাস। আর উঠতে বসতে আমাদের সঙ্গে হরিদাসের তুলনা-মূলক সমালোচনা শুনতে শুনতে হাড় জ্বলতে লাগলো আমাদের। মা থেকে সুরু করে সকলের মুখে এক কথা—"দেখ্ তোরা দেখ্! হরিদাসের কাছে শেখ একটু।"

নন্তু বললো, "দেখ আশু, এর একটা প্রতিবিধান দরকার। এ অপমান আর সহ্য হচ্ছে না।"

আমি বললাম, "এ বিষয়ে—আমি তোর সঙ্গে একমত। কিন্তু করা যায় কি?"

"একদিন ওকে নির্জ্জনে কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে চাঁদা করে চাঁটি লাগাইগে চল।"

"দূর! বাড়ীতে প্রকাশ পেয়ে গেলে আমাদেরই চাঁটি খেতে হবে।"

"কিন্তু কী পাজী দেখেছিস? আমাদের সব অবাধ্য আর খারাপ ছেলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে গুণের অবতার সেজে বসে আছে।"

"দেখতে অথচ ভিজে বেড়ালটি! এ দিকে তো হাঁদাপেটা গাধারাম, কিন্তু পেটে পেটে শয়তানীটি দেখেছিস তো? সকালে যেই ছোটকাকার খাবার সময় শুনেছে লেবু নেই, অমনি না বলতেই ছুটে কিনে নিয়ে আসা হলো!"

"হুঁ শেষ পর্য্যন্ত করবেন তো ওই বাজার সরকারি, তাই এখন থেকেই হাত পাকাচ্ছেন!"

"তা' ঠিক! ওই বুদ্ধি নিয়ে আর কতো হবে? আমাদের তো বাবা দোকান বাজারের নামেই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।"

"ওর ওতেই আনন্দ! সেদিনকে দেখলি না—বনমালী সামনে থাকতেও মেজকাকার সার্ট নাকি আনতে লণ্ড্রীতে ছুটলো!"

"এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে ঘুষি—" নন্তু বলে ওঠে, "স্রেফ্ একখানি প্রকাণ্ড ঘুষি। ঘুষিটি লাগিয়ে দিব্যি গালিয়ে নেওয়া হোক—'ভালোছেলেগিরি চলবে না তোমার। আমাদের দলে মিশতে পারো তো থাকো, না হলে'—"

বলতে বলতেই দেখি হরিদাস আসছে।

চুপ হয়ে গিয়ে আমরা চোখে চোখে ইসারা করলাম, এখন নয় সময় বুঝে।

কিন্তু হরিদাসকে ঘুষি লাগানো আর হলো না আমাদের! সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ হরিদাসই একদিন আমাদের সকলের গালে ঠাশ্ করে এক বিরাট চড় বসিয়ে দিলো!

সে চড়ের জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছট্‌ফট্ করছি আমরা!

নসু বলেছে শীগগিরই ও গেরিমাটি কিনে কাপড় ছোপাবে, রাসু বলেছে ও সুবিধে মতো একদিন গিয়ে হাওড়ার পুলের ওপর থেকে সোজাসুজি নীচের দিকে ঝাঁপ্ দেবে, আর আমি টিনচার আইডিনের সাহায্যে আত্মহত্যা করা যায় কিনা তাই নিয়ে গবেষণা করছি। হরিদাসের সঙ্গে একত্রে বাস করা আর সম্ভব নয়।

একটি চড়ে আমাদের তিনজনের গাল লাল!

আর হরিদাস এই বিরাশী সিক্কা ওজনের চড়টি আমাদের গালে বসিয়ে দু'দিনের জন্যে দেশে গেছে মা-বাপের সঙ্গে দেখা করতে।

কি বলছো? একটি চড়ে তিনজনের গাল লাল হলো কি করে তাই জিজ্ঞেস করছো?

তা' হাতে করে তো ঠিক মারেনি—মেরেছে অন্য রকমে!

চড় মানে চড় নয়, চড় ওর রেজাল্ট।

এ বছর স্কুল ফাইন্যালে ফার্স্ট হয়েছে মাকড়তলা হাইস্কুলের হরিদাস খাসনবীশ!

আর আমাদের রেজাল্ট? সেটাও কি আমার মুখ দিয়ে বলিয়েই ছাড়বে?

● অমর বাণী

আনমনে আমি সেই ছোট্ট ফুলটাকে তুলতে গেলাম। ফুলটি যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মুচ্‌কি হেসে বলে উঠল—কত দেশ ত ঘুরলে! কতো ভাল কাজ করেছ বলে মনকে সান্ত্বনা দিলে। কিন্তু তুমি কি কখনও দরজা খুলে এই ফাঁকা সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে শিশির-ভেজা আমার চেহারার দিকে একবারও চেয়েছ? জীবনে কি একটিবারও একেবারে নিঃস্বার্থভাবে অন্য একটি লোকেরও কোনও উপকার করেছ? তবে? ওই যে চাষীটা ওখানে বসে আছে সে তোমার চেয়ে অনেক বড়—কারণ সে দিনরাত খেটে লোকের মুখের রুটি জোগায়। আর তুমি অহমিকায় মেতে ভাবছ, দুটো বড় বড় কথা বলে লোকের বিরাট কিছু উপকার করলে! —এ. ই. কোপার্ড

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পা টিপে টিপে পিছনের ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল মহেশ।

ঘরের মধ্যে টেবিলের একপাশে চেয়ারে বসে পিতা, তাঁর পাশে বসে সহদেব মিত্র—যাকে মহেশ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আশে পাশে আরও অনেক লোক—সবাই চাপা সুরে কথা বলছে—এমন কি তার পিতাও।

পরদাটা বাতাসে সরতেই পিতার দৃষ্টি তার উপর পড়ে, হুঙ্কার ছাড়েন তিনি,—"কে রে, ওখানে কে—ভীম কোথায় গেলি, দেখ্‌তো দরজায় কে?"

ভীম আসবার আগেই উত্তর দিতে হয় মহেশকে—"আমি বাবা—"

পিতার রুক্ষ কণ্ঠস্বর কানে আসে, "তুই ওখানে কেন—যা' ওখান হতে।"

সরে যায় মহেশ। দুঃখে বেদনায় ছোট্ট বুকটা তার ভরে ওঠে। রাগও হয় বড় কম নয়।

পিতার কাজ এতই বেশী,—সময়াভাবে একমাত্র মাতৃহীন পুত্র মহেশকে তিনি দেখতে পারেন না। মহেশ পায় না পিতার স্নেহ-স্পর্শ, তাঁর মুখের একটি মিষ্ট কথা। তাকে দেখে বুড়ি মোক্ষদা, দেখে পিতার খাস চাকর ভীম।

এক এক সময় অধীর হয়ে ওঠে মহেশ, তার কাঁদবার ইচ্ছা হয়।

আচ্ছা, এমন করে তাকে বাড়ীতে রেখেই বা লাভ কি—তাকে ইস্কুলে আর পাঁচজন ছেলের মত দিলেই তো হয়। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে ইস্কুলে যায়, কত আনন্দ ওদের। ওরা সকলের সঙ্গে মিশতে পায়, মহেশ কারও সঙ্গে কথা বলতে পায় না। ভীম তাকে সঙ্গে করে বৈকালে বেড়াতে নিয়ে যায়, ভীমের ভয়ে কোন ছেলে তার দিকে ঘেঁষতে পারে না।

এবার বিদ্রোহী হবে মহেশ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। বেশ বড় হয়েছে সে, আট ছাড়িয়ে নয় বছরে পড়েছে, অনেক কিছু বুঝতে পারে। পিতা আর সকলের মত অফিসে যান না,—অথচ বেশীর ভাগ সময়ই ওই সহদেব লোকটার সঙ্গে বাইরে ঘোরেন; যে সব লোক তাঁর কাছে আসে, তাদের একজনও ভালো লোক নয়—মহেশ বেশ বুঝতে পারে।

সেদিন পাশের বাড়ীর নণ্টে—কি অপমানটাই না তাকে করে গেল। ভীমের অজ্ঞাতে সে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কুল খাচ্ছিল। মোক্ষদাকে গোপন করে এগুলি সে সরিয়েছে, তাই বাড়ীতে খাওয়ার সাহস হয় নি।

নণ্টে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল, মুখ ভেংচাল, মুখ বিকৃত করল।

কুল খাওয়ার লোভেই যে সে এসেছে সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না, তাই উদার মহেশ গোটাকত কুল বার করলে পকেট হতে, বললে, "কুল খাবি ভাই—এই নে।"

কিন্তু নণ্টে যেন গোখরো সাপ, ফণা ধরে ছোবল দেয় আর কি—"ছ্যাঃ ছ্যাঃ, সরস্বতী পুজো না হতে কুল খাচ্ছিস যে বড়—লজ্জা হচ্ছে না? আমরা ইস্কুলে পড়ি—মা সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি না দিয়ে কুল খাইনে তা' জানিস? জানবিই বা কি করে? থাকিস তো ঝি-চাকরের কাছে, বাপ তো ব্ল্যাক-মার্কেটিং করে অনেক টাকা রোজগার করছে, ছেলেকে একটা শিক্ষা দিতে পারে না—ছ্যাঃ—"

মহেশ যেন একেবারে নিভে যায়, কুলশুদ্ধ হাতখানা কখন ঝুলে পড়ে, টোপা টোপা কুলগুলো পথে ছড়িয়ে পড়ে।

"ব্ল্যাক-মার্কেটিং—ব্ল্যাক-মার্কেটিং কি?" মহেশ জিজ্ঞেস করে।

নণ্টের বিদ্যায় অর্থ কুলায় না, তবু সে ঠকে না—মুখ ভেংচে বলে, "এত বড় ছেলে ব্ল্যাক-মার্কেটিং মানে জানে না—আমার ছোট ভাইটা পর্য্যন্ত মানে জানে। তোর বাপকে যেদিন পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে সেদিন বুঝবি—ও জিনিসটা কি—"

বলতে বলতে সে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের কনুই রেখে বক দেখিয়ে মুখ ভেংচে মহেশের সামনে তিনপাক ঘোরে—"দুয়ো, এত বড় ধাড়ি ছেলে কিছু জানে না, তাই সরস্বতী পুজোর আগে কুল খায়—দুয়ো—"

ভীমের সাড়া পেয়ে নিমেষে সে অদৃশ্য হয়।

আগুন ঢালা চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকে মহেশ, তারপর কখন জানি তার দু' চোখ ছাপিয়ে নেমে আসে হু হু করে শ্রাবণের ধারা।

নাঃ, নণ্টের কথা সহ্য হয় না,—সে ইস্কুলে যায় না এই তার অপরাধ! ইস্কুলে সে যাবেই। আর সেই ব্ল্যাক-মার্কেটিংয়ের কথাটাও পিতাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

পিতা তাকে আর সকলের মত ইস্কুলে দিন, নচেৎ সে চলে যাবে—চলে যাবে অনেক দূরে, যেখানে কেউ তার সন্ধান পাবে না।

না চাইতে সে পায় প্যাণ্ট সার্ট কোট,—পায় কত খেলার জিনিস—কুকুর, কাকাতুয়া, ময়না, কিন্তু সে এসব চায় না; সে চায় ইস্কুলে পড়তে। কবে একজন শিক্ষক এসেছিলেন, মাস কতক পড়িয়ে পিতার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি চলে গেছেন, আর আসেননি। সহদেব বিদ্রূপের সুরে

বলেছিলেন—"ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর না মাধব, কোন্‌দিন তোমাকেই ছোবল মারবে। তার চেয়ে মূর্খ হয়ে থাক্, সে অনেক ভালো।"

দেখতে পারে না মহেশ সহদেবকে; একদিন ঢিল মেরে তার পা খোঁড়া করে দেবে, এই তার মতলব। ওর কথা সহ্য হয় না; পিতাকে সে-ই যেন অনেক দূরে নিয়ে গেছে।

সামনের বস্তীতে থাকে বিষ্টু দাস, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তালি দেওয়া প্যাণ্ট বেনিয়ান পরে ইস্কুলে যায়, তবু সে সুখী। তার আশা আছে সে মানুষ হবে, বড় হবে, পিতা-মাতাকে সুখী করবে। মহেশের চোখে সে কত বড়—প্রশংসার পাত্র।

এবার আর দরজার আড়ালে নয়, পরদা সরিয়ে দৃঢ়পদে পিতার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মহেশ।

ভিতরের ঘরে মাধব একা বসে কি সব হিসাব করছিলেন, টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজপত্র; মানুষের সাড়া পেয়ে সচকিতভাবে তিনি সেগুলো সরাতে গিয়ে মহেশকে দেখে আশ্বস্ত হলেন। যে ছেলে কখনও তাঁর দিকে ঘেঁষে না, সে আজ এতখানি সাহস নিয়ে এল,—মাধব তাই অবাক হয়ে তাকান।

বেশ বুঝা যায়, এ ঘরে ছেলের আসাটা তিনি পছন্দ করেন না; তাকে তিনি খেলার জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান।

সোজা পিতার সামনে দাঁড়িয়ে মহেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "আমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও বাবা, আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে চাই।"

"মানুষ—"

পিতা কাষ্ঠ হাসি হাসেন, "ইস্কুলে যাবে বই কি, সামনের বছর তোমায় উপযুক্ত করে একেবারে ফাইভ কি সিক্স ক্লাসে ভর্ত্তি করে দেব। তুমি যাবে বড় ইস্কুলে, ছোট ইস্কুলে তোমাকে দেব না।"

মহেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "আমি এখনি ইস্কুলে ভর্ত্তি হব বাবা। এত বড় ছেলে, আমি জানিনে সরস্বতী পূজোর আগে কুল খেতে নেই, তাই না নণ্টে আমায় কত কথা বলে গেল। আমি একটা ছেলের সঙ্গে খেলা করতে পাইনে, কথা বলতে পারিনে—"

বলতে বলতে কোথা হতে অবাধ্য অশ্রু এসে পড়ে—সে দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে থাকে।

পিতা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, পুত্রকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের রুমালে তার মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনার সুরে বললেন, "এখন তো ভর্ত্তি করা চলবে না মহেশ, আগামী বছর তুমি ভর্ত্তি হবে। এখন এত বড় ছেলে হয়ে প্রথম শ্রেণীর ছোট ছেলেদের সঙ্গে অ আ, ক খ, পড়তে নিশ্চয়ই তোমার লজ্জা করবে, তাই তোমায় খানিকদূর পড়িয়ে নাম-করা বড় ইস্কুলে ভর্ত্তি করব। আমাদের সহদেববাবু সামনের সোমবার হতে তোমায় পড়াবেন। জানা-শোনা লোক, পড়তে তুমি—"

রুদ্ধ রোষে চেঁচিয়ে ওঠে মহেশ, "না না, ওর কাছে আমি পড়ব না। সহদেববাবু তোমায় ব্ল্যাক-মার্কেটিং শিখিয়েছে, আমাকেও শেখাবে। তুমি অন্য মাষ্টার ঠিক কর বাবা, আমি সহদেববাবুর কাছে কিছুতেই পড়ব না।"

"ব্ল্যাক-মার্কেটিং—তুই বলছিস কি মহেশ—?" বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করেন মাধব।

মহেশ পিতার বিবর্ণ মুখের পানে তাকায়—একটু চুপ করে থেকে বলে, "পাড়ার সবাই জানে, ওরাই তো আমায় বললে। পুলিস তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, শীগ্‌গিরই তোমায় নাকি জেলে নিয়ে যাবে। কিন্তু—"

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আর্দ্রকণ্ঠে বলে সে, "তুমি জেলে গেলে আমি একলা কোথায় থাকব বাবা, আমায় কে দেখবে ?"

পিতার বুকের মধ্যে সে মুখ লুকায়।

বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে ওঠে, মাধব চমকে যান—তবু মুখে হাসি টেনে এনে শুষ্ক কণ্ঠে বলেন, "দুর বোকা ছেলে, আমি জেলে যাব কেন—আমি কি চোর না ডাকাত? দেখছিস তো এইজন্যেই তোকে কারও সঙ্গে মিশতে দেই নে, ওরা তোকে কত মিথ্যে কথাই না বলেছে। নাঃ, যত তাড়াতাড়ি পারি এ বাসা ছাড়ব, তোকে নিয়ে এখানে থাকা চলবে না।"

"কিন্তু বাবা—" ভয়ে ভয়ে মহেশ জিজ্ঞাসা করে, "ব্ল্যাক-মার্কেটিং কি, ওরা ও কথা বললে কেন ? ওরা বললে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে,—তুমি নাকি এর মানে জান ?"

মুখখানা লাল হয়ে ওঠে মাধবের, বলেন, "হ্যাঁ, মানে আমি বুঝাব একদিন, আজ নয় মহেশ। আজ তুমি যাও, তোমার নূতন মোটর বাইক আসছে, অর্ডার দিয়েছি, ভীমের সঙ্গে মোটর বাইকে বেড়াবে—কেমন ?"

উৎফুল্ল হয়ে উঠে মহেশ, দুই হাতে পিতার গলাটা জড়িয়ে ধরে সে—"বাবা, তুমি খুব ভালো, সত্যি তুমি খুব ভালো—"

মহানন্দে সে লাফাতে লাফাতে বার হয়ে যায়।

অত্যন্ত অবসন্নভাবে মাধব চেয়ারে বসে থাকেন, সামনের ছড়ানো কাগজপত্র দেখবার উৎসাহ আর পান না।

সহদেব মিত্রের কাছে পড়বে না মহেশ, অগত্যা রাখতে হয় স্কুলের শিক্ষক মণি দত্তকে।

প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে ছাত্রকে পড়াতে আরম্ভ করেন মণি দত্ত। চমৎকার লোক তিনি, পাঠ্য বিষয়গুলি গল্পের মত মহেশকে পড়িয়ে বুঝিয়ে দেন—বুঝতে বা শিখতে মহেশের এতটুকু বিলম্ব হয় না, ফলে কয়মাসের মধ্যেই সে অনেকখানি শিখে ফেলে।

মুস্কিল বাধল একদিন—

মণি দত্ত জানালেন—তিনি আর পড়াতে পারবেন না, এ বাড়ীতেই তিনি আসবেন না। কারণ, পুলিসে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

"পুলিস !" মহেশ স্তব্ধ হয়ে যায়।

মণি দত্ত জানান—"ওই কে তোমাদের পাশের বাড়ীর ছেলেটি—নণ্টে না কি নাম,—তোমার সঙ্গে আলাপ করে, তোমাদের বাড়ী আসা-যাওয়া করে। সে অনেক কথা পুলিসকে বলে দিয়েছে, যার জন্যে এ বাড়ীতে যারা আসা-যাওয়া করে সকলের উপরই পুলিস দৃষ্টি রাখছে। তোমার বাবাকে তুমি একথা জানিয়ে দিয়ো মহেশ—তাঁর সঙ্গে দেখা হল না—নইলে বলে যেতাম। কাল হতে আমি আর আসব না, আমার টাকাটা তুমি চেয়ে রেখে দিয়ো, সময়মত এসে নিয়ে যাব।"

শিক্ষক চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল মহেশ। কত কিছুই ভাবতে লাগল।

একদিন নিজেই সে নণ্টের বাড়ী উপস্থিত হল।

অবাক হয়ে যায় শুধু নণ্টে নয়, নণ্টের ভগ্নীপতি, পুলিসের আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের একজন নাম-করা অফিসার—সেদিন বেড়াতে এসে মহেশকে দেখে যেমন অবাক হন, তেমনি খুশীও হন।

নণ্টেকে দিয়ে তিনি কিছুটা খবর সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু সেই উড়ো প্রমাণের উপর নির্ভর করে মাধব বোসের মত গণ্যমান্য একজন লোককে গ্রেপ্তার করার সাহস তাঁর হয় নি।

মহেশকে অত্যন্ত সমাদরে তিনি গ্রহণ করেন, তার সঙ্গে অনেক গল্প করেন,—তাকে খেতে দেন। মহেশ প্রথমটায় মুগ্ধ হয়েছিল,—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অফিসার তাদের বাড়ী-ঘরের গল্পে, তার পিতার প্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন, সেই মুহূর্ত্তে সে সচকিতে নিজেকে সংযত করে ফেললে।

নণ্টে বললে, "জান মহেশ। তোমার বাবা অবিশ্যি গুরুজন, তাঁর সম্বন্ধে কথা বলা পাপের কাজ। কিন্তু তিনি যা' কাজ করছেন—তাতে দেশের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অর্থ তিনি চুরি করছেন। ধরা যেদিন পড়বেন সেদিন তাঁর ভয়ানক শাস্তি হবে।"

পুলিস অফিসার মহেশের বিহ্বল মুখের পানে তাকিয়ে সাহস দেন, "কিন্তু তোমার কোন ভয় নেই মহেশ—কেবল তোমাকে কেন—তোমার বাবাকেও আমি বাঁচাব। আমাদের পুলিস কমিশনার জেনেছেন তোমার বাবা নাকি ব্ল্যাক-মার্কেটিং করে লাখ লাখ টাকা পেয়েছেন, এখনও পাচ্ছেন। আমি সব বাঁচিয়ে দেব, তোমার বাবাকে বাঁচাব—যদি তুমি—"

বলতে বলতে তিনি থেমে যান, তারপর বলেন—"তোমার বাবা যখন বাড়ী থাকবেন না, তখন আমাকে যদি তোমার বাবার ঘরে একবার নিয়ে যেতে পার।"

মহেশ অনায়াসেই মাথা কাত করে—"তাই করব, আপনাকে আমি নণ্টেকে দিয়ে খবর দেব।"

এর পর ফিরে আসে মহেশ।

বেশ বুঝতে পারে—তার পিতাকে জেলে দেওয়ার জন্যে এরা চেষ্টা করছে। সে কল্পনায় দেখতে পায় পিতার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বাঁধা, পুলিস তাঁকে নিয়ে চলেছে জেলখানায়।

কি উপায় করবে ক্ষুদ্র মহেশ তাই ভাবে।

আবার দেখা হয় নণ্টের সঙ্গে—

একমুঠো চকোলেট তার পকেটে দিয়ে নণ্টে বললে, "শোন্,—তোর বাবা তো বাড়ী নেই,—দাদাবাবুকে খবর দেব কি আসবার জন্যে?"

একটা চকোলেট মুখে দিয়ে মহেশ বললে, "এখন নয়, ভীম দরজায় আছে, পরে বলব এখন।"

নণ্টে খবর দেয়, "কাল ভোরে নাকি তোদের বাড়ী পুলিস যাবে মহেশ। আমি চুপি চুপি শুনেছি—দাদাবাবুরা যখন এসব কথা বলছিল।"

কাল ভোরে পুলিস আসবে! মহেশের মাথায় আগুন জ্বলে।

পিতা সকালেই কোথায় গেছেন, সন্ধ্যায় ফিরবার কথা। তিনি কিছুই জানতে পারবেন না,

পুলিস হয় তো সন্ধ্যায় বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলবে, তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। সামনের বস্তী-বাড়ীটা একদিন যেমন তছনছ করেছিল, তাদের বাড়ীও তেমনি করবে।

নন্টের দাদাবাবু বারবার কাগজপত্রের খোঁজ নিয়েছেন, কি জানি কি আছে সে সব কাগজ-পত্রে। পিতাও সেই সব কাগজপত্র দেখেন, কি সব হিসাব করেন, মহেশ গোপনে দাঁড়িয়ে দেখে যায়।

আচ্ছা, সে কি পারে না তার পিতাকে রক্ষা করতে? কোনরকমে সেই কাগজপত্রগুলো যদি সে পুড়িয়ে দিতে পারে—পিতা বেঁচে যাবেন। কাগজপত্র গেলে পুলিসের ক্ষমতা নেই তার পিতাকে ধরতে পারে।

মোক্ষদা ঘুমাচ্ছে দুপুরে, দেয়াশলাইটা সংগ্রহ করে মহেশ, মোক্ষদা জানতেও পারে না।

পিতার ঘরের সামনে ভীমও ঘুমিয়ে পড়েছে, দরজার চাবি তার মাথার পাশে রয়েছে। নিঃশব্দে মহেশ চাবিটা হস্তগত করে, তারপর দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দেয়।

তারপর—

ঘরের যেখানে যা' খাতাপত্র—কাগজ ছিল, সব তাড়াতাড়ি বার করে মেঝেয় রাখে; তারপর একটি দেয়াশলাই-কাঠি জ্বেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূ ধূ করে জ্বলে ওঠে।

জ্বলল আগুন,—সে আগুন শুধু কাগজ পত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না।

নিঃশব্দে মহেশ দাঁড়িয়ে থাকে। জ্বলল টেবিলক্লথ, ধরল চেয়ারের পা; আলমারীর কপাট,—জানালার পথে অনর্গল ধূম বার হয়।

"খোকাবাবু—খোকাবাবু—"

বাইরে হতে দরজায় ধাক্কা দেয় ভীম,—অবিরত ধাক্কা মারে—"দরজা খোল—খোল দরজা—"

নাঃ, খুলবে না মহেশ—এ ঘরে যা' কিছু আছে সব পুড়ে যাক, পিতাকে গ্রেপ্তার করবার প্রমাণ পাবে না পুলিস। মহেশ যদি পুড়ে যায়,—তাতেও তার দুঃখ নেই, তার সান্ত্বনা, সে পিতাকে বাঁচিয়েছে। সমস্ত কাগজ না পোড়া পর্য্যন্ত সে বার হবে না।

আগুন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে—ধূ ধূ করে সব জ্বলে ওঠে—বাইরে অনেক লোকের কোলাহল শোনা যায়। তারপর কখন দরজা ভেঙ্গে পড়ে, ভীম ছুটে প্রবেশ করে তাকে কোলে করে বাইরে আসে—মহেশ তা' জানে না।

জ্ঞান ফিরে আসে মহেশের—

মাঝখানে দুইটি দিন কেটে গেছে তা' সে জানতে পারে নি।

চোখ মেলতেই সে দেখতে পায় ভীমকে,—মাথার কাছে বসে আছেন মাধব—তাঁকে সে দেখতে পায় না। ক্ষীণ কণ্ঠে মহেশ ডাকে—"ভীমদা—"

"এই যে খোকাবাবু—কি বলছ আমায়, বল—"

ভীম মহেশের উপর ঝুঁকে পড়ে।

মহেশ ক্ষীণ কণ্ঠেই বলে, "আমার কি হয়েছে, ভীমদা, কতক্ষণ আমি শুয়ে আছি এমন করে?"

"কতক্ষণ— ?"

ম্লান হেসে ভীম বললে, "ক্ষণ নয় দাদাবাবু, আজ তিনদিন পরে তোমার জ্ঞান হল। ডাক্তারবাবু তোমায় বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন, তুমি আজকের দিনটা বিশ্রাম নাও, কাল যত পার কথা বল।"

অস্ফুটকণ্ঠে মহেশ বললে, "আমি তো বেশী কথা বলছিনে ভীমদা,—আমি কি পুড়ে গিয়েছি আগুনে,—এত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন!"

ভীম জবাব দিলে, "আর একটু দেরী হলে আমরা তোমাকে আর পেতাম না খোকাবাবু। তোমার জামাকাপড়ে আগুন ধরেনি বটে, তবু আগুনের তাপে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।"

মহেশ জিজ্ঞাসা করে—"বাবা ফিরেছেন, তাঁকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায় নি তো?"

মাথার কাছে বসে ছিলেন মাধব—অনুতাপে তিনি পুড়ছেন। এ কয়দিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি পুত্রের মাথার কাছে বসে আছেন!

আর্দ্রকণ্ঠে তিনি বললেন, "না মহেশ, পুলিস এসেছিল বটে, কিন্তু প্রমাণ অভাবে আমায় গ্রেপ্তার করতে পারে নি। পুলিস আমার ঘরে শুধু ছাই পেয়েছে, তোমার আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় ও ঘরের একটা জিনিসও রক্ষা পায় নি; আলমারী চেয়ার টেবিল—সব পুড়ে গেছে! ফায়ার বিগ্রেড এসে পড়ায় সারা বাড়ীময় আগুন ছড়াতে পারে নি।"

পুত্রের মুখের সামনে তিনি ঝুঁকে পড়েন—

কম্পিত হাত দু'খানা দিয়ে পিতার হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে মহেশ, তার মুদিত চোখের কোণ বেয়ে নিঃশব্দে কেবল অশ্রুধারা ঝরে পড়ে।

পিতার চোখেও অশ্রুধারা নামে—

রুদ্ধকণ্ঠে মহেশ ডাকে—"বাবা—"

মাধব উত্তর দেন—"এই তো—পাশেই আছি মহেশ—বল—।"

"আমরা বড়লোক হতে চাইনে বাবা, আমরা গরীব হয়েই থাকব—তুমি ও সব কাজ আর করবে না বল।"

পুত্রের কপালে হাত রেখে মাধব বললেন—"না মহেশ আর কখনও করব না, তোকে আমি কথা দিচ্ছি।"

মহেশ বললে, "আর ওই সহদেব মিত্রকে বাড়ী আসতে দেবে না বল?"

মাধব একটু হাসলেন, বললেন, "না, ওকে আর আসতে দেব না মহেশ। তুই এতটুকু ছেলে হয়ে আমাকে শুধু জেলের দণ্ড থেকে নয়, নরক থেকেও বাঁচাতে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিস, এ কথা আমি কি কোনদিন ভুলতে পারি মহেশ!"

পুত্র চোখ মেলে পিতার পানে তাকায়—বিশ্বাস করে কথাটা—

"নণ্টেকে আমি একথা ভালো করেই বলব—আমার বাবা চোর নয়;—কি বল বাবা?"

পিতা গভীর স্নেহে বলেন, "আর আমি তাকে জানাব—আমার মহেশ এতটুকু ছেলে হয়ে আমাকে বাঁচাতে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল।"

পীড়িত মহেশ ম্লান হাসি হাসে।

দেশলাইওয়ালী

—শ্রীদেবব্রত ঘোষ

সকাল থেকে ভয়ানক তুষারপাত শুরু হয়েছে। বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, গাছ-পালা, সব ঢাকা পড়ে গেছে সাদা বরফের নীচে। যতদূর দেখা যায় শুধু সাদা—সাদা—আর সাদা। যেন শীত বুড়োটা তার সাদা বরফের চাদরখানি পৃথিবীর উপর মেলে দিয়ে চেপে বসেছে। জনবিরল পথ-ঘাট। কোলাহল নেই। নিদারুণ শীতে স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রাণের স্পন্দন। মাঝে মাঝে পত্রহীন ওক্, বীচ, এলম্ ও সীডারের বিষণ্ন বনভূমিকে আন্দোলিত করে বয়ে যাচ্ছে শীতের মন-কেমন-করা হু হু হাওয়া। এই ভাবে বেলা গড়িয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা।

একটি ছোট্ট মেয়ে হেঁটে চলেছে

আজ বছরের শেষ সন্ধ্যা।

একটি ছোট্ট মেয়ে এই প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাত উপেক্ষা করে খালি মাথায় জনবিরল পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। গায়ে তার একটি মাত্র ছেঁড়া জামা। শীতে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

মেয়েটি চলেছে দেশলাই বিক্রী করতে। তাই সে তার ছেঁড়া জামার পকেট-গুলি ছোট-বড় নানারকম দেশলাইয়ের বাক্সে ভর্ত্তি করেছে, আর হাতেও নিয়েছে কয়েকটা বাক্স। পায়ে তার মায়ের একজোড়া ছেঁড়া চটি। তার পায়ের তুলনায় অসম্ভব রকম বড়। সেই চটি

পরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক সময় মেয়েটির পা থেকে একপাটি খুলে গিয়ে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা দুষ্টু ছেলে এসে সেটা তুলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। মেয়েটি প্রথমে মনের দুঃখে খুব একচোট কাঁদল। তারপর ভাবল—শুধু একপাটি চটি দিয়ে আর কি হবে! তাই সে আরেক পাটিও ছুড়ে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে লাগল।

কিছুদূর হাঁটার পর তুষারের কণা জমে মেয়েটির মাথার চুল একেবারে সাদা হয়ে গেল। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে শুধু এক মনে দেখতে দেখতে চলেছে রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারে কেমন সুন্দর আলোর মালা পরেছে—নববর্ষকে স্বাগত জানাবার জন্যে। মাঝে মাঝে আশে পাশের বাড়ী থেকে ভেসে আসছে ভাজা মুরগীর মধুর গন্ধ।

এই ভাবে পথ চলতে চলতে মেয়েটি একটি বড় বাড়ীর দেওয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল। সেখানে তুষারের ঝড় ঠিক সোজাসুজি তার গায়ে লাগে না।

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েটি মনে মনে বলল—"চমৎকার জায়গা! এখানেই একটু জিরিয়ে নিই। আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। তুষার-ঝড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে হাত-পাগুলো জমে একেবারে নীল হয়ে গেছে। এই অবস্থায় বাড়ী ফিরলেও রক্ষা নেই। এখনো পর্য্যন্ত একটা দেশলাই বিক্রী করতে পারিনি। বাবা জানতে পারলে বকাবকি করবেন। তার চেয়ে বরং দেশলাই কাঠি জ্বেলে একটু গরম হয়ে নিই। পরে না হয় আবার একবার চেষ্টা করে দেখব।"

মেয়েটি কাল-বিলম্ব না করে হাতের দেশলাই-বাক্স থেকে একটা কাঠি বার করে ধরাল। মৃদু লাল শিখা তুলে দেশলাই কাঠিটা মোমবাতির মত জ্বলতে লাগল।

"আঃ—কি আরাম?" হাতে ধরা জ্বলন্ত কাঠিটা দেখে তার মনে হল যেন সে একটা ঝক্‌ঝকে নতুন পেতলের ষ্টোভের সামনে বসে আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে কাঠিটা নিভে যেতেই তার চারিদিকে সব অন্ধকার হয়ে গেল। মেয়েটি আবার একটা কাঠি ধরাল—এবার দেশলাই কাঠির ম্লান আলোয় সে দেওয়ালের জায়গায় একটা সুদৃশ্য কাঁচের ঘর দেখতে পেল। ঘরের মধ্যে বিরাট খাবার টেবিল। ধবধবে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। তার ওপরে—দু'টো প্লেটে নানারকমের মুখরোচক খাবার। একটিতে পেঁয়াজের রসে ভাজা কয়েকটা আস্ত মুরগী আর অপরটিতে আপেল, ন্যাশপাতি, বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল। পাশে রাতের খাবারের সরঞ্জাম ছুরি, কাঁটা, ডিস, প্লেট্ ইত্যাদি।

মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে খাবারগুলির দিকে চেয়েছিল। এমন সময়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল প্লেট থেকে একটা ভাজা মুরগী জীবন্ত হয়ে উঠে একটা কাঁটা আর ছুরি

মুখে করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মুরগীটি যখন খুব কাছে চলে এল, ঠিক সেই সময় দমকা হাওয়ায় দ্বিতীয় কাঠিটাও নিভে গেল।

মেয়েটি আবার একটা কাঠি ধরাল। এবার সে কাঁচের ঘরের জায়গায় একটা সুন্দর খ্রীষ্টমাস গাছ দেখতে পেল। রঙ্-বেরঙের ছবি দিয়ে পরিপাটি করে সাজান। বড় বড় দোকানের শো-কেসে যেমন দেখা যায় তার চেয়েও সুন্দর আর মনোরম। গাছের ডালে হাজার হাজার মোমবাতি জ্বলছে। সে যে-মুহূর্ত্তে এইগুলি ধরার জন্যে হাত বাড়াল সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কাঠিটাও নিভে গেল।

হতাশ হয়ে মেয়েটি আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু একি ?—খ্রীষ্টমাস গাছের আলোগুলি যে অন্ধকার আকাশের বুকে তারা হয়ে ঝিক্‌মিক্ করছে—সে চোখ রগড়ে আবার আকাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল একটা তারা ছুটছে। পিছনে তার বিরাট লেজ। আর তারাটি যেন তার দিকেই তীব্র গতিতে ছুটে আসছে!

মেয়েটি মনে মনে বলল—"নিশ্চয়ই কোন লোক মারা গেল। ঠাকুমার কাছে শুনেছি পৃথিবীতে যখনি একজন করে লোক মরে, তখনি আকাশ থেকেও একটি করে তারা খসে পড়ে। আজ আমার ঠাকুমা নেই। অনেকদিন আগে মারা গেছেন। বেঁচে থাকলে তিনি আমাকে কত আদর করতেন"—বলে মেয়েটি আর একটা কাঠি ধরাল। এবার সে তার পরলোকগতা ঠাকুমাকে দেখতে পেল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। মুখে তাঁর ফুটে উঠেছে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় হাসি। আনন্দের আতিশয্যে মেয়েটি—"ঠাকুমা, ঠাকুমা"—বলে কয়েকবার ডেকে উঠল।

"তুমি আমাকে স্বর্গে নিয়ে চল ঠাকুমা। আমি খুব ভালো ভাবেই জানি এই কাঠিটা নিভে গেলে তুমিও এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যেমন করে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেছে পেতলের ষ্টোভ, ভাজা মুরগী আর খ্রীষ্টমাস গাছ। তুমি আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না—ঠাকুমা। দোহাই তোমার"—বলে মেয়েটি দেশলাই-বাক্সে যতগুলি কাঠি ছিল সব এক সঙ্গে ঘষতে লাগল। কাঠিগুলি একসঙ্গে জ্বলে উঠতেই প্রখর সূর্য্যের আলোও যেন তার কাছে ম্লান হয়ে গেল। সেই আলোয় মেয়েটি দেখল তার ঠাকুমাকে। কি চমৎকার তাঁকে দেখতে লাগছে—

ঠাকুমা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে তার ক্ষুদে নাতনীটিকে কোলে তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেলেন নীল আকাশের মাঝে—স্বর্গের নন্দন-কাননে—যেখানে মরজগতের কোন দুঃখ-কষ্ট, হিংসা-দ্বেষ মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না—যেখানে ভয় নেই, শীত নেই, অশান্তি নেই—সেই চির-সুন্দরের রাজ্যে।

পরদিন সকালে পাড়া-পড়শীরা এসে দেখল মেয়েটি শীতে কুঁকড়ে দেওয়ালের কোণে মরে পড়ে আছে। আর তার চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে রাশি রাশি পোড়া

দেশলাই কাঠি। শীতে কষ্ট পেয়ে মরেছে মেয়েটি, তবু তার মুখে লেগে আছে প্রভাতী তারার মত এক টুকরো স্নিগ্ধ হাসি। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ তাকে বিন্দুমাত্র বিকৃত করতে পারেনি। সকলেই অনুমান করল মেয়েটি নিদারুণ শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে দেশলাই কাঠিগুলি জ্বেলেছিল। কিন্তু হায়—সে বাঁচতে পারেনি। মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে সে চলে গেছে মানুষের চির-বাঞ্ছিত স্বর্গধামে।*

---

* ডেনিশ গল্পের অনুবাদ।

● জেনে রাখা ভালো

১নং চিত্র। যে-সব বৃষ্টির ফোঁটা পৃথিবীতে পড়ে, তাদের বয়স কত জান? পড়বার তিন সপ্তাহ আগে থেকে তাদের তৈরী হতে হয়। তাই মাটিতে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলির বয়স ২১ দিন। যে-সব বৃষ্টি সাগরে পড়ে, সাগরের পঞ্চাশ ফুট নীচের জলের সঙ্গে সেগুলি মিশ্রিত হয় না।

২নং চিত্র। মানুষ, রেসাস জাতীয় বানর এবং পায়রা লাল, হলুদ, সবুজ, নীল এবং বেগুনী রংয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পায়। মানুষ আরো বহু রংয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখে। কিন্তু ঘড়িয়াল, পেঁচা, বাদুড়, বিড়াল, কুকুর এবং গিনিপিগের চোখে রংয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে মুরগী ও মাছেরা দু' একটা রংয়ের পার্থক্য ধরতে পারে।

৩নং চিত্র। পাশ্চাত্য জগতে সাম্যের দেশেও ঘোরতর অসাম্য! সেখানে শ্রমিকরা নিজেদের ইচ্ছামত সঙ্ঘ গড়তে পারে না। সরকারের সঙ্ঘে যোগ দিতে বাধ্য। তথাকথিত সাম্য বা গণতন্ত্র—যে কোন বাদই পশ্চিম থেকে প্রচারিত হোক—সেখানে দুর্ব্বলকে চিরদিন প্রবলের দাসত্ব করতে হয়। কেবল ভারতের সাম্যনীতি যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ।

টারজানের ত্রিংশ অ্যাড্‌ভেঞ্চার

—সব্যসাচী

আজব দেশে

টমি চলে যাবার পর টারজান অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো ওদিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো :

'চলো রয়, এবার নিজেদের পথ খুঁজি।'

দু'জনেই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কোন্ পথে গেলে সুবিধে হবে তার মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়ে টারজান আর রবিন্ রয় এগুতে লাগলো সামনের দিকে।

অতি সন্তর্পণে, অতি সতর্ক দৃষ্টিতে তাদের পথ চলা সুরু হলো।

রবিন্ রয় যে অঞ্চলটায় ছিলো, সেই অঞ্চলটা ছিল একেবারে জনবসতিশূন্য। চারিদিকে খাড়া পাহাড়—সেই পাহাড় ডিঙ্গানো মানুষের অসাধ্য। তাই কোন দিন কোন মানুষ নিজের চেষ্টায় সেখানে যেতে পারেনি। নেহাৎ দৈবাৎ বিমান-দুর্ঘটনায় সেখানে গিয়ে পড়েছিলো রবিন্ রয় আর ঈগল-দুর্ঘটনায় পড়েছিল টমি।

কিন্তু এখন তারা যে অঞ্চলে এসে পড়েছে—নরমুণ্ড-শিকারী বুনোরা মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আসে পশুশিকারে। আর কিছুটা এগুলে তো ওদেরই রাজত্ব।

তাই তারা চলছিল অতি সন্তর্পণে। টারজান আজন্ম বনে লালিত-পালিত—বুনো পশুদেরই মতো তারও আছে ঘ্রাণশক্তি। অতি দূর থেকেই টারজান তাদের উপস্থিতি টের পায়।

একটা দিন চলে গেলো—ক্বচিৎ দু'একটা হরিণ বা চিতা ছাড়া অন্য কিছু তাদের চোখে পড়লো না।

পরদিন সকালে আবার রওনা হলো আজব দেশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রথম থেকেই টারজান কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে; তার যেন মনে হতে লাগলো—কোথাও একটা কিছু অশুভ ইঙ্গিত সে পাচ্ছে।

রয় কী যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল টারজানকে; কিন্তু টারজান ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে তাকে কথা বলতে নিষেধ করলো। তারপর চুপি চুপি বললো :

'চুপ! কাছে ধারে কোথাও যেন শত্রু রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন ওদের গন্ধ পাচ্ছি।'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন্ রয় :

'আচ্ছা, সত্যি কি টারজান তুমি দূর থেকে মানুষের গন্ধ টের পাও?'

টারজান বললো :

'বাতাসের গতি স্বপক্ষে থাকলেই টের পাই। বাতাস যদি উল্টো দিক থেকে বয়, কিংবা যদি বাতাস বন্ধ হয়ে যায়—তাহলে আর কিছুই টের পাইনে।'

টারজানের কথা শেষ হতে না হতে বোঁ করে ছুটে এলো এক বর্শা। টারজান তাকিয়ে দেখলো—পেছনের ঝোপের আড়ালে কারা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চীৎকার করে রয়কে সাবধান করে দিয়েই টারজান সামনের দিকে দৌড়ুতে আরম্ভ করলো। রবিন্ রয়ও ছুটলো তার সঙ্গে উর্দ্ধশ্বাসে। কিছুদূর যেতে না যেতেই টারজান একটা শব্দ শুনতে পেলো—'ধপাস্'। টারজান তাকিয়ে দেখলো—রবিন্ রয় মাটিতে পড়ে গেছে—তার পিঠে একটা বর্শা বিঁধে রয়েছে।

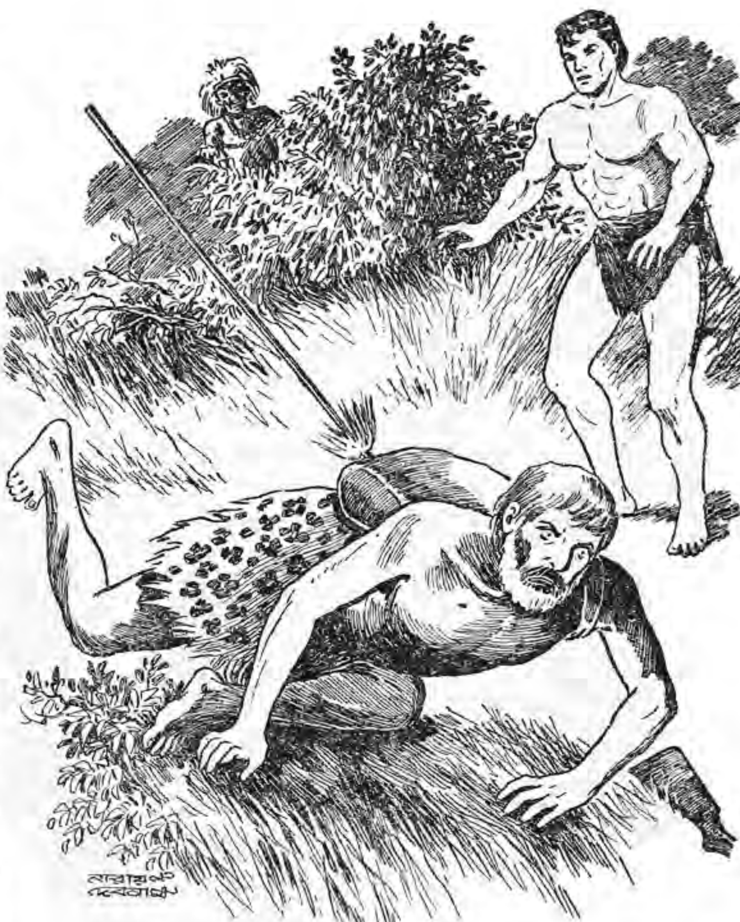
পিঠে একটা বর্শা বিঁধে রয়েছে

একটুখানি পিছনে হটে এসে টারজান এক হাতে রবিন্ রয়কে তুলে নিলো কাঁধে। তারপরই দৌড়ুতে সুরু করলো।

বোঁ করে তার মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেলো বর্শা—আর একটা গেলো পাশ দিয়ে।

চীৎকার করে উঠলো রবিন্ :

'সাম্লে চলো টারজান।'

চিতার মতো দ্রুত গতিতে ছুটে চল্‌ছে টারজান। খানা-খন্দ লাফিয়ে সে পার হয়—সুবিধে পেলেই গাছের ঝুরি ধরে সে এক ধাক্কায় চলে যায় চল্লিশ হাত।

তার সঙ্গে তাল রেখে চলে—তেমন সাধ্য কারো নেই। সুবিধেমত একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে টারজান কাঁধ থেকে নামালো রবিন্‌কে। তারপর একটানে তার পিঠ থেকে বর্শাটা খুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো টারজান :

'পিঠে কি লেগেছে ?'

রবিন্ বল্লো :

'না—আমার সোনার তালগুলোই এবার আমায় রক্ষা করেছে। পিঠের ব্যাগটায় ছিল সোনা ভর্ত্তি—তাতেই আটকে গিয়েছিল বর্শাটা।'

একটু দম নিলো টারজান। রবিন্ জিজ্ঞেস করলো :

'এখন কি করবো ?'

টারজান একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো :

'এক্ষুণি আবার আমাদের তৈরী হতে হবে। কারণ যারা আমাদের সন্ধান পেয়েছে, তারা এত সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে না। তুমি তোমার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডানদিকে খেয়াল রাখো—আমি বাঁ দিকটা দেখছি।'

রবিন্ রয় তার বন্দুক-ধনুতে তীর লাগিয়ে নিশানা ঠিক করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওদিকে টারজানও তার ধনু বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমেই টারজান একটি শিকার করলো—চুপি চুপি এগিয়ে আসছিলো একটা বুনো, ওকে তৈরী হবার সুযোগ না দিয়েই টারজান অব্যর্থ সন্ধানে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো।

এদিকে গর্জ্জে উঠলো রয়ের পিস্তল—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আর্ত্তকণ্ঠের কলরব। দল বেঁধে যে সব বুনো টারজানদের আক্রমণ করতে এসেছিল, তাদের বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে কোনদিন পরিচয় ঘটেনি। তাই অকস্মাৎ একসঙ্গে বজ্রের গর্জ্জন আর আঘাত এবং বিদ্যুতের স্ফুরণ দেখে ভয় পেয়েছিল। হয়তো বা বুঝেছিলো—স্বয়ং বিধাতাই বুঝি তাদের বিরোধী।

তাই আর্ত্তকণ্ঠের কলরব তুলে তারা পালিয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে টারজান আবার আর একটাকে বিঁধে ফেলেছে।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মুহূর্ত্তে বুনোদের দল এই অরণ্যই পরিত্যাগ করলো।

উত্তেজনায় রবিন্ রয়ের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে আর তখন চলতে পারছে না। গাছের ডাল ভেঙ্গে টারজান তাকে খানিক হাওয়া করে আবার চাঙ্গা করে তুললো।

একটু সুস্থ হয়ে তারা আবার চলতে সুরু করলো। কিন্তু চলতে গিয়ে পথ আর ফুরায় না। অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করে রয় :

'আজব দেশ কত দূরে টারজান !'

তাকে আশ্বাস দিয়ে টারজান বলে :

'এত অধীর কেন বন্ধু ! যাবেই তো ! বরং একটুখানি চারদিকে তাকিয়ে পথ চলো !'

চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করে রবিন্ :

'কেন, আরো বিপদ আছে নাকি ?'

'বিপদের কি আর শেষ আছে ? কিন্তু আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছি—একবার চোখ মেলে তাকিয়ে অরণ্যের সৌন্দর্য্য দেখে নাও। তুমি সভ্য জগতের মানুষ—সভ্য জগতেই ফিরে যাচ্ছো—হয়তো এই সুযোগ আর নাও পেতে পারো।'

টারজানের কথায় কিছুটা আশ্বাস পেলো রবিন্—তবু আরও একটু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করলো :

'কিসের বিপদের কথা বলছিলে ?'

'বলছিলাম—যদি আর কোন বুনোদের দল কিংবা হিংস্র পশু আক্রমণ না করে, তবে আর তেমন কোন বিপদ নেই।'

সভয়ে জিজ্ঞেস করে রবিন্ ঃ

'কেন, বুনোরা আবারও আসবে নাকি ? ঐ তো পালালো।'

হেসে উঠ্লো টারজান ঃ

'না, ওরা বোধ হয় আর আসছে না।'

'আর যে হিংস্র পশুর কথা বলছিলে—এখানে কি তারও ভয় আছে নাকি ?'

নিজের ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে টারজান রয়কে চুপ করিয়ে দিয়ে বল্লো ঃ

'ঐ যে কান পেতে শোন।'

রবিন্ রয় খানিক কান পেতে থেকেই তাড়াতাড়ি পিস্তল হাতে তুলে নিলো। হেসে বললো টারজান ঃ

'পিস্তলের প্রয়োজন হবে না বন্ধু! এই যে দেখছো খাড়ি—এটা পার হয়ে কেউ এপারে এসে তোমার উপর আক্রমণ চালাতে পারবে না।'

টারজানের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেলো—বিরাট-দেহ এক পশুরাজ হেল্‌তে দুল্‌তে চলেছে খাড়ির ওপর দিয়ে। দু'জন মানুষকে দেখতে পেয়ে তার আস্ফালন বেড়ে গেলো। কিন্তু নিরুপায় সে—লাফিয়ে তাদের উপর পড়বার ক্ষমতা তার নেই।

টারজান আর রবিন্ রয় হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মানুষের এই আস্পর্দ্ধা দেখে পশুরাজ দাঁত খিঁচিয়ে তাদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করলো। ভয় পেলো না দেখে বুঝিবা লজ্জায় পশুরাজ নিজেই গেলো সরে।

টারজান বললো রবিন্ রয়কে ঃ

'বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই আজব দেশে কত যে আজব জীবজন্তু আছে, তা' না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতে পারবে না।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রয়। টারজান বলতে লাগলো ঃ

'তোমরা তো জ্ঞানী সভ্য মানুষ। তোমরা তো জানো যে প্রাচীনকালে পৃথিবীতে বিরাট-আকার বহু জীবজন্তু বর্ত্তমান ছিল—আজ তারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে!'

ঘাড় নেড়ে রয় টারজানের উক্তি সমর্থন করলো। টারজান বললো ঃ

'কিন্তু ঐ সব বৃহৎকায় জীবজন্তর অনেকগুলিই এখনও বর্ত্তমান রয়েছে এই আজব দেশে। আমরা এখন এই আজব দেশেই এসে পৌঁছেছি।'

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো রয় ঃ

'রাজধানী কত দূরে?'

'রাজধানী এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে। ঐ দেখ, ঐ দেখ রয়—সামনে ওই উঁচু ঘাস-বনটার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

তাকিয়ে দেখলো রবিন্ রয়—সরীসৃপ-জাতীয় বিরাট এক জীব—মাথা বাড়িয়ে তালগাছের ডগার পাতা খাচ্ছে।

এইভাবে পথ চলছে তারা দু'জনে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। একটা ভালো দেখে গাছ খুঁজে নিয়ে তারই উপর রাত কাটালো টারজান আর রবিন্ রয়।

তালগাছের ডগার পাতা খাচ্ছে [পৃঃ ৬৪৭

পরদিন সূর্য্য উঠবার আগেই আবার তারা বেরিয়ে পড়েছে। সোজা পশ্চিম দিক ধরে চলছে। অকস্মাৎ আলোর আভা তাদের চোখ ঝল্‌সে দিলো।

অবাক্ হয়ে ভাবলো রবিন্—

'এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! এখানে কি পশ্চিম দিকে সূর্য্যোদয় হয় নাকি! আজব দেশের কি সবই আজব কাণ্ড?'

টারজান তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বললো:

'সূর্য্য নয় এটা ইঞ্জিনিয়ার—ঐটে হলো আজব দেশের রাজপ্রাসাদ।'

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল রবিন্ রয়।

আজব দেশের সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদের উপর যে সূর্য্যকিরণ পড়েছিলো, তারই প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়েছিলো ওদের চোখেমুখে।

আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর ক্রমে রাজধানীর রূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। দূর থেকে দেখে মনে হয়—সমৃদ্ধ নগরী। বিরাট্ বিরাট্ প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাগান, বাজার সব দেখা যেতে লাগলো।

তাই অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই রবিন্ জিজ্ঞেস করলো:

'বেশ তো আধুনিক সুসভ্য শহর বলেই মনে হচ্ছে—এখানে এরোপ্লেন পাওয়া যাবে না কেন বলতো !'

রহস্য ভাঙ্গলো না টারজান। মুচকি হেসে বললো ঃ

'একটু সবুরই কর না বন্ধু ! গিয়েই বুঝতে পারবে সব।'

এগিয়ে যেতে লাগলো তারা।

*

প্রাসাদ-প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়েছিল প্রহরী। দূর থেকে দু'জন অপরিচিত লোককে নগরের দিকে আসতে দেখে আগেই সোরগোল তুললো। নগরের ভিতর সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। সবাই নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে ঐ প্রহরীর দিকে—পরের সংবাদ জানবার জন্যে।

ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে এলো। এবার প্রহরী জানালো—দু'জনেই অস্ত্রধারী, শেতাঙ্গ, কিন্তু অসভ্যের মতো পোশাক পরিধানে। এবং তাদের মধ্যে একজনকে যেন—

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সহসা চীৎকার করে উঠলো প্রহরী ঃ

'টারজান ! টারজান !'

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সংবাদ গিয়ে পৌঁছালো রাজপ্রাসাদে—রাজার কানে।

রাজা বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন ঃ

'রাজরথ বার করো। আর রাণীকেও শীগ্‌গির সংবাদ দাও।'

আধঘণ্টা মাত্র সময়—তারই মধ্যে রাজার রথ তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলো। তার উপর যথোপযুক্ত মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বসে আছেন রাজা আর রাণী।

টারজান আর রবিন্ রয় তখনো নগরে প্রবেশ করেনি—এখনও বেশ খানিকটা দূরে। তারা দেখলো—সহসা নগরদ্বার খুলে গেলো। আর সারিবদ্ধভাবে বেরিয়ে আস্‌ছে একদল-সিংহ !

রবিন্ রয়ের মুখ কালো হয়ে গেলো। সে টারজানকে চীৎকার করে বললো ঃ

'ঐ দেখ টারজান ! ওরা একদল সিংহকে ছেড়ে দিয়েছে—এরা সব আমাদের ছিঁড়ে খাবে।'

টারজান ভালোমন্দ কিছুই বললো না। সে কেবল রয়ের কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে যেতে লাগলো।

টারজানের এই তুষ্ণীভাব রয়ের ভালো লাগলো না। সে আবার টারজানের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো ঃ

'টারজান ! টারজান ! ঐ দেখ।'

ওদিকে ততক্ষণে সিংহবাহিনী অনেকটা কাছে চলে এসেছে। এবার তারা স্পষ্ট দেখতে পেলো—সিংহবাহিনীর পেছনেই একটা সোনার রথ—আর সেই রথে বসে আছেন তথাকার রাজা আর রাণী।

টারজানকে দেখতে পেয়েই রাজা চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

'স্বাগতম্ টারজান, স্বাগতম্ ! বহুদিন পর আবার তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে জানাচ্ছি আমাদের সাদর অভিনন্দন ! এসো ! আমার প্রাসাদ-দ্বার তোমার জন্যে খুলে দিয়েছি।'

রাজার রথ চলে এলো টারজানের কাছে। রাজা রথ থামিয়ে বললেন ঃ

'কোথায় রে ! টারজানের রথ কোথায় ?'

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এলো আর একটা সিংহ-বাহিত রথ।

রথের চালক সসম্মানে সিংহের লাগাম তুলে দিলো টারজানের হাতে। টারজান রয়কে সঙ্গে নিয়ে চড়ে বসলো সেই রথে। রাজার রথ আর টারজানের রথ চললো পাশাপাশি।

টারজান রবিন্ রয়কে পরিচিত করিয়ে দিলো রাজার সঙ্গে এই বলে যে ঃ

'পাহাড়-ঘেরা এক অঞ্চল থেকে দীর্ঘকাল নির্জ্জনবাস করে এসেছেন আমাদের এই বন্ধুটি—রবিন্ রয় নাম। এই পাহাড়ে তিনি অল্পসল্প সোনা কুড়িয়ে পেয়েছেন—আর তাই নিয়ে এসেছেন ইনি এখানে।'

টারজানের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন রাজা। তিনি বললেন ঃ

'সোনা আবার কুড়িয়ে পেতে হয়? টারজান, তুমি তোমার বন্ধুকে বলো যে তিনি যত সোনা চান, আমি তাই দেবো তাঁকে।'

টারজান রয়কে রাজার কথাটা বুঝিয়ে বললো। টারজানের কথা শুনে রবিন্ রয়ের তাক লেগে গেলো।

তাদের রথ এতক্ষণ রাজপুরীতে প্রবেশ করলো। এতক্ষণে রবিন্ রয়ের খেয়াল হলো—রাজার প্রাসাদটা আগাগোড়াই সোনায় তৈরী। আর তা' ছাড়া চারদিকেই সোনার ছড়াছড়ি।

রবিন্ রয় এতক্ষণে বুঝতে পারলো সোনার প্রাসাদের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়েছিল বলেই তাদের চোখে এত আলো লেগেছিলো।

টারজান আর রবিন্ রয় আজব দেশের রাজপুরীতে অতিথি হয়ে রইলো। রবিন্ রয় ভাবলো—বাইরের জগতে গিয়ে যখন সে সব বলবে, তখন কেউ বিশ্বাস করবে না যে সত্যি এমন কোন দেশ আছে—যেখানে রাজপ্রাসাদ হয় সোনার আর সিংহেরা টানে রথ।

তাদের থাকবার জন্যে যে খাট দেওয়া হয়েছে, তাদের খাবার জন্যে যে সব পাত্র দেওয়া হয়—সব কিছুই সোনার তৈরী। আর শুধু তাই নয়—এতদিন ধরে তারা যে সব পোশাক পরে আসছিল—তাও সব তাদের ছাড়তে হলো। কত মণিমাণিক্য-খচিত রাজপোশাক উঠলো তাদের দেহে।

একদিন টারজান বললো রবিন্‌কে ঃ

'রাজা বলছিলেন—তুমি যদি এই আজব দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাও, তবে যত সোনা খুশী তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।'

ঘাড় নেড়ে বললো রবিন্ রয় ঃ

'পাগল হয়েছো বন্ধু! কেউ যদি একখানা স্বদেশের টিকিট কেটে চার ইঞ্জিনযুক্ত এরোপ্লেনও আমাকে এনে দেয়—তবু আমি এই আজব দেশ ছাড়বো না।'

সুরু হলো তাদের আজব দেশের আজব জীবন।

[একত্রিংশ অ্যাড্‌ভেঞ্চার পরে বাহির হইবে।

—অমরনাথ রায়

অনেকদিন আগেকার কথা।

জনকরাজা তখন মিথিলায় রাজত্ব করছেন।

একবার জনকরাজার খুব বড় রকমের একটা যজ্ঞ করবার ইচ্ছে হলো। যেমন ইচ্ছে, তেমনি কাজ। যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ হলো।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যজ্ঞ-সভায় আর লোক ধরে না। বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন সেই সভায়। কেউ এসেছেন কুরু দেশ থেকে, আবার কেউ বা পাঞ্চাল থেকে। সভায় বিখ্যাত পণ্ডিতদের মাঝে অনেক মুনি-ঋষিও আছেন।

জনকরাজা সেই সভায় ঘোষণা করলেনঃ তিনি এক হাজার গাভী দান করতে চান।

শুধু গাভী নয়। প্রত্যেকটি গাভীর মাথায় আবার সোনার ভার চাপানো আছে। কাজেই এ দানের মূল্য বড় কম নয়!

রাজা বললেনঃ সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর সব চেয়ে বেশী, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় সবচেয়ে বেশী পণ্ডিত—তিনিই এই দান গ্রহণ করুন।

রাজার এই ঘোষণা শুনে সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকেন। উঠে গিয়ে দান গ্রহণ করবার সাহস কারুরই হয় না। সত্যিই তো, নিজেকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা যে সহজ কথা নয়! কাজেই কেউই এগুতে চান না।

এমন সময় সবাই অবাক্ হয়ে যান এক ঋষিকে রাজার কাছে এগিয়ে যেতে দেখে। সৌম্য-দর্শন ঋষি রাজাকে বলেন ঃ এ দান আমিই গ্রহণ করব।

সেই সৌম্য-দর্শন ঋষির নাম যাজ্ঞবল্ক্য। উপস্থিত মুনি, ঋষি আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তো চটে লাল! তাঁরা ভাবেন ঃ যাজ্ঞবল্ক্যের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! মহা মহা পণ্ডিতদের মাঝে যাজ্ঞবল্ক্য কিনা নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বলে জাহির করতে চান! তাঁদের সহ্য হয় না এ স্পর্দ্ধা।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করছেন

এক পণ্ডিত রাগ সামলাতে না পেরে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন ঃ আমাদের সকলের চেয়ে আপনার ব্রহ্মজ্ঞান কি বেশী?

নিজের প্রতিভায় যাজ্ঞবল্ক্যের ছিল অসীম বিশ্বাস। জানতেন তিনি—উপস্থিত পণ্ডিতদের মধ্যে কেউই তাঁকে তর্কে হারাতে পারবেন না। তবু বিনয়ের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য জবাব দেন ঃ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী বলে জাহির করার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। ব্রহ্মজ্ঞানীদের আমি প্রণাম জানাই। আমার কিছু গাভীর প্রয়োজন আছে বলেই জনকরাজের এই দান আমি গ্রহণ করছি।

তবুও অব্যাহতি পান না যাজ্ঞবল্ক্য। অশ্বল, উষস্ত, কহোল, চাক্রায়ণ, গার্গী ও আরও কত পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তোলেন। কিন্তু সব প্রশ্নেরই খুব ভাল উত্তর দেন যাজ্ঞবল্ক্য। সভায় ধন্য ধন্য রব ওঠে। যাজ্ঞবল্ক্য হন জয়ী।

যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম ছিল ব্রহ্মরাত বা দেবরাত। খুব অল্প বয়সে যাজ্ঞবল্ক্য যান বৈশম্পায়ন মুনির কাছে—যজুর্বেদ শিখতে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ঐ বেদে মহাপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। যজুর্বেদে মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা—দুইই এক সঙ্গে থাকতো। যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদের ব্যাখ্যার অংশটুকুকে আলাদা করে এক নতুন সংস্করণ

বের করলেন। তার নাম দেওয়া হলো শুক্ল-যজুর্ব্বেদ। এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্য বেদের সংস্কার করলেন।

তখনকার দিনে যাজ্ঞবল্ক্য সত্যিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি বলতেন ঃ আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ কিনা পরমেশ্বর। এই আত্মার আলোকেই আমরা সব কিছু দেখি বা বুঝি। আবার ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তিনি ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই। ব্রহ্মের যে যথার্থ স্বরূপ তা' জগতের রূপ, রস ইত্যাদি সব গুণের বাইরে। আত্মার যথার্থ স্বরূপও ঠিক তাই। তাই আত্মাকে ভালভাবে বুঝলে এই সংসারে জন্ম-মৃত্যু, শোক-দুঃখ প্রভৃতির সকল ভয় দূর হয়ে যায়। এই আত্মাকে বশে আনতে হলে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। প্রাণায়াম যোগ-সাধনার এক বড় অঙ্গ।

যাজ্ঞবল্ক্য যে শুধু মহাজ্ঞানী ছিলেন তা' নয়। তিনি ছিলেন একজন বড় যোগী। অতবড় জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন যে তাঁর জ্ঞান অসম্পূর্ণ। সত্যিই তো, একজন মানুষের পক্ষে জগতের সব কিছু জানা কি সম্ভব? তাই যাজ্ঞবল্ক্য নিজে যেটা জানতেন না, সেটা অন্যের কাছে শিখতে চাইতেন। তিনি চাইতেন শুধু জ্ঞান আর জ্ঞান।

যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন সাধারণ লোকের মতই সংসারী। প্রচুর টাকাও তিনি রোজগার করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর সংসার ছেড়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর দুই স্ত্রী—কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ী। কাত্যায়নী ছিলেন সাধারণ মেয়ে। সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত। সংসারই তাঁর কাছে সব। তাই তিনি স্বামীর কাছ থেকে ধন লাভ করেই সন্তুষ্ট রইলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তিনি স্বামীকে বললেন ঃ ধন তো অসার বস্তু। পৃথিবীর সব ধন-রত্ন পেলেও তো আমি অমর হতে পারব না! কাজেই আপনার যে অমূল্য জ্ঞান-রত্ন আছে, তারই কিছু ভাগ দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।

খুশী হন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর কথায়। ঘর ছেড়ে যাবার আগে তিনি মৈত্রেয়ীকে দিয়ে যান ব্রহ্মজ্ঞান। বলেন ঃ একমাত্র আত্মদর্শন হলেই মানুষ চিরকালের জন্যে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পায়। মৈত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দেন তিনি—আত্মার স্বরূপ কি, কি ভাবে এই আত্মাকে ঠিক চিনতে পারা যায়।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে গেলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। কিন্তু যে অমূল্য উপদেশ তিনি দিয়ে গেলেন—যুগ যুগ ধরে সে উপদেশ অমর হয়ে রইলো।

সেকালের নরবলি

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কাটোয়া-শ্রীরামপুরে নরবলি

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া একটি প্রসিদ্ধ মহকুমা। বিখ্যাত স্থান। বৈষ্ণবদের পুণ্যতীর্থ। কাটোয়ার নিকটে ছিল শ্রীরামপুর নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম। শতবর্ষ পূর্ব্বে এখানে ছিল ডাকাতদের বাসস্থান। গ্রাম ছিল নিবিড় বনজঙ্গলে ঢাকা। লোকজনের বসতি ছিল কম। কাটোয়া হইতে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত যে পথটি গিয়াছিল, সেই পথটি ছিল নির্জ্জন। সেখানে ভয়ে ভয়ে পথিকেরা চলিত। অনেকেই কাটোয়া আসিত গঙ্গা-স্নানের জন্য অথবা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দীক্ষার স্থান, বৈষ্ণবসাধকগণের সমাধি-মন্দির ও আখড়া দেখিতে। বর্দ্ধমানের দূরদূরান্তরের পল্লী হইতে আসিত যাত্রী-দল। গঙ্গাস্নানে আসিত একজন পুরুষের সঙ্গে হয়ত দশজন স্ত্রীলোক, শিশু ও বালক।

শ্রীরামপুরের কালী-মন্দির ছিল এক মহাশ্মশানের নিকট। মন্দিরটি সুগঠিত। চারিদিকে ছিল প্রাচীর ঘেরা। বড় বড় গাছপালার আড়ালে সঙ্কীর্ণ পথ। দুইদিকে কাঁটাগুল্ম, বড় বড় তরুশ্রেণী। অসংখ্য তালগাছ। সে নিবিড় অরণ্যে ছিল হিংস্র বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, চিতাবাঘ, বন্য শৃগালের বাসা। অনেকে রাত্রিতে সেই পথ চলিতে বাঘের কবলে পড়িয়া প্রাণ দিত, আর কেহ প্রাণ দিত ডাকাতের হাতে।

শ্রীরামপুরের মন্দির কে কবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কে-ই বা প্রতিষ্ঠা করেন, সে সংবাদ আমরা জানি না। লোকে বলিত এ কালী—শ্মশান-কালী। কেন না নিকটেই শ্মশান। ভয়ঙ্করী সে পাষাণী মূর্ত্তি। দেবী রক্তনেত্রা, মুক্তকেশী, শ্মশানালয়বাসিনী, অঞ্জনের ন্যায় তাঁর গাত্রবর্ণ। পিঙ্গল দুইটি চক্ষু, বাম হস্তে মদ্যপূর্ণ পাত্র ও মাংস, সদ্যকর্ত্তিত নরশির, দক্ষিণ হস্তে শিবামুণ্ড, সদা নরমাংস চর্ব্বণরত, হাস্যমুখা, নানালঙ্কারভূষিতা, বিবসনা, মত্তা, সদাশিবের হৃদয়ে পদযুগল সংস্থিত। এক তান্ত্রিক সাধক, নাম তাঁহার ছিল ভৈরবানন্দ। এই মন্দিরের পাশে একটি ছোট ঘরে করিতেন শবসাধনা, দেবীর পূজা-অর্চ্চনা অমাবস্যার বিশেষ তিথিতে—শনি ও মঙ্গলবার দিতেন নরবলি।

১৮১০ সাল। সে দেড়শত বৎসরের কথা। সেদিন ছিল অমাবস্যা, উপরন্তু ছিল শ্রাবণের গভীর নিশা। ভৈরবানন্দ তাঁহার ছোট ঘরখানিতে ধুনি জ্বালাইয়া সাধনা করিতেছেন। বিশাল জটা তাঁহার মাথার দুইপাশ দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ব্যাঘ্রছাল। উপবেশনও করিয়াছেন ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর। বলিষ্ঠ শরীর। বয়স পঞ্চাশের কম নয়। গলায়, করপ্রকোষ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। চক্ষু দুইটি রক্ত জবার মত লাল। বাহিরে ভীষণ দুর্য্যোগ। একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে ঝড়-জল। দুইজন ভীষণাকৃতি শিষ্য ভৈরবানন্দের পাশে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন। সেই দুর্য্যোগেও শ্মশানে জ্বলিতেছে চিতা। ঝড়-বৃষ্টিতেও চিতার আগুন নিবে না।

ভৈরবানন্দ সহসা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি সংবাদ কালিকানন্দ, কোন খবর পেলে বলির? কিহে বামানন্দ, কোন তথ্যই মিললো না? মা কি আজ উপোসী রইবেন? মিলবে না নররুধির?

উত্তর দিল তারা—এই নিশীথ রাতে, এই ঝড়জলের মধ্যে বলি কোথায় মিলবে গুরুদেব ?

মিলবে না ? মিলবে না ? রক্তপিপাসাতুরা রক্ত পাবেন না—এ কি সম্ভব ! যদি না মিলে আমিই বুকের রক্ত দিয়ে পাষাণীর রক্ত-পিপাসা দূর করব। হা ! হা ! হা ! কি বিকট হাস্য। সেই সময়ে গর্জ্জিয়া উঠিল মেঘ, বজ্র ডাকিল কড়্ কড়্ কড়্।

সহসা দরজায় ভীষণ জোরে কে দিল ধাক্কা। শব্দ হইল। ভীত, সন্ত্রস্ত কাতরকণ্ঠে একজন পথিকের চীৎকার ও ঘন ঘন ধাক্কা। সে শব্দ ভিতরে প্রবেশ করিল কিনা কে জানে ? ভৈরবানন্দ শুনিলেন সে শব্দ। উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন মা মা মা ! বুঝি তোর দয়া হল। কালিকানন্দ দরজা খোল।

কালিকানন্দ দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবামাত্র একটা ঝড়ের ঝাপটা আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিল। হোমের ক্ষীণ দীপ্তিতে দেখিলেন ভৈরবানন্দ একজন কৃষ্ণকায় যুবক গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তাহার শরীর, কাপড়-জামা ভিজিয়া গিয়াছে। ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টির জল ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কাতরকণ্ঠে কহিল— আমাকে আশ্রয় দিন।

ভৈরবানন্দ বলিলেন—বৎস, নির্ভয়ে অবস্থান কর। কালিকানন্দ শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা দাও।

পথিক শুষ্ক বস্ত্র ও গা মুছিয়া প্রণাম করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ভৈরবানন্দকে বলিল—প্রভু আমার জীবন রক্ষা করলেন। আমার বড় বিপদ। আমার স্ত্রী ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়ে বাড়ী রয়েছেন। তাঁর ঔষধ নিয়ে যাচ্ছি, কোন রকমে ঔষধ রক্ষা করেছি। বৃষ্টি ধরলেই গাঁয়ে চলে যাব। এ সময়টা শুধু আমাকে আশ্রয় দিন।

জয় মা কালী, নির্ব্বিঘ্নে থাক বৎস ! মায়ের মন্দিরে ভক্ত মাত্রেরই আশ্রয় মিলে। মা তোমাকে চান বলেই তো নিয়ে এসেছেন। কালিকানন্দ অতিথির শয্যা রচনা কর। যথাযোগ্য খাদ্য দাও।

সামান্যমাত্র খাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র ঘরের এক পাশে চিন্তিত, ব্যথিত মনে নানা উৎকণ্ঠা লইয়া বিপন্ন অতিথি শুইয়া পড়িল।

আকাশে তেমনি মেঘ ডাকিতেছিল। বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড়ের নিবৃত্তি ছিল না। অতিথি শুইবার অল্প পরেই ভৈরবানন্দ গেলেন দেবীর মন্দিরে। পূজায় বসিলেন। ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে। পূজার আয়োজন প্রস্তুত ছিল। স্বস্তিক মন্ত্র পড়িতেছিলেন— ওঁঃ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীং শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঃ বজ্রকণ্ঠে।

পূজার সন্ধিক্ষণে মন্দির মধ্য হইতে বিরাট খড়্গ লইয়া বাহির হইলেন ভৈরবানন্দ—চীৎকার করিয়া বলিলেন—কালিকানন্দ নিয়ে এস বলি ! নিয়ে এস বলি ! নিয়ে এস—নিয়ে এস !

স্বরে কি ব্যাকুলতা !

ভীষণাকৃতি দুই চেলা সেই ঘুমন্ত অর্দ্ধমৃতপ্রায় অতিথিকে নিমেষ মধ্যে ধরিয়া আনিয়া যূপকাষ্ঠে তাহার মাথা ঢুকাইয়া দিল। সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। তারপর—ভৈরবানন্দ তুলিলেন খড়্গ। নিমেষ মধ্যে চমকাইল বিদ্যুৎ। অতিথির চিরদিনের জন্য জীবন শেষ হইল।

ভৈরবানন্দ মহানন্দে যেমন বলি শেষে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এমন সময় কড়্ কড়্ কড়্ ভীষণ শব্দে হইল বজ্রপাত। মন্দিরে পড়িল বজ্র।

পরদিন প্রভাতে দেবীর কাছে পূজা দিতে আসিয়া লোকেরা বিস্মিতভাবে দেখিল—এক ব্যক্তির মুণ্ডবিহীন দেহ মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আর বজ্রাঘাতে নিহত ভৈরবানন্দ পড়িয়া আছেন মন্দিরের সোপানের উপর।*

কাটোয়া ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাঙ্গলার নবাব সে সময়ে কাটোয়ার চারিদিকে ডাকাতি, কালী-মন্দিরে নরবলি—এই সব ছিল নিত্যকার ঘটনা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পথিকগণের নিরাপত্তার জন্য কাটোয়াতে একটি প্রহরী-বেষ্টিত ছোটখাটো গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি চুরি, ডাকাতি, নরবলি প্রভৃতি নিবারণের জন্য কাটোয়াতে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কোন চোর বা ডাকাত ধরা পড়িলে (সাধারণতঃ ডাকাতরা নরবলি দিয়া কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যাইত) মুর্শিদকুলি খাঁর আদেশে এই সব দুষ্কার্য্যের অপরাধীদের নিকটবর্ত্তী গাছে ফাঁসি দিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত—অন্যান্য ডাকাতদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য।

● জেনে রাখা ভালো

১নং চিত্র। জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়, এও কি সম্ভব? সম্ভব যদি সে তার তরলাবস্থা ত্যাগ করে বরফের মত কঠিনাবস্থা লাভ করে। উত্তর-মেরুর কাছে, গ্রীনল্যাণ্ডে বরফের পাহাড় প্রায় এক মাইল অবধি উঁচু হয়। দক্ষিণ-মেরুর কাছে বরফের পাহাড় প্রায় দু' মাইলের কাছাকাছি যায়। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল!

২নং চিত্র। মানুষ সেই অনাদিকাল থেকে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার চেষ্টা যখনই সফল হবার উপক্রম হচ্ছে দেখা যায় প্রকৃতিতে আর এক অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটে! নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেশমকীটকে পালন করা সত্ত্বেও চীনের কোন কোন অঞ্চলে আশানুরূপ সুতা তৈরি করা সম্ভব হয় নি। তাই বৈজ্ঞানিক কুঞ্চিত মুখে তাঁর ব্যর্থতার কারণ চিন্তা করছেন।

৩নং চিত্র। এক সময়ে ঘোড়া ফড়িংএর ভয়ে পালাত একথা শুনলে লোকে হাসবে। কিন্তু এক সময় ছিল ঘোড়ার আকার ছিল যখন সাধারণ বিড়ালের মত, আর ফড়িং নামে ফড়িং হলেও আকারে সে দু' ফুটের চেয়েও ছিল বড়।

রাজভক্তির প্রতিযোগিতা

—শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র

সে আজ অনেকদিনকার কথা।

পোল্যাণ্ড তখন রুস-শাসনাধীন। হতভাগ্য দেশের অধিবাসিগণকে শাসক-সম্প্রাদায়ের নিকট হ'তে সর্ব্বদা নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করতে হ'ত। পদানত দেশবাসীদের উচ্চহারে কর দিতে হ'ত। রাজভাষায় তাদের কথাবার্ত্তা বলতে হ'ত; এমন কি নিজেদের ভাষায় কথাবার্ত্তা বললে শাসকশ্রেণীর নিকট হ'তে তাদের শাস্তি পেতে হ'ত। শাসিতেরা যতই প্রাণপণে শাসকদের সন্তুষ্ট করতে চাইত, শাসকশ্রেণী ততই তাদের দেশের সম্রাজ্ঞীর প্রতি শাসিতদের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠত।

এই সময়ে এক ধনী পোল-ভদ্রলোক একটি দাঁত নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। শেষে তিনি উপায়ান্তর না দেখে সেটিকে তুলে ফেলবার জন্যে মনস্থ করলেন। ভদ্রলোকটি বিত্তশালী, তিনি ত' আর নিজে দন্ত-চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দাঁত তোলাতে পারেন না, তাতে তাঁর সম্মানে বাধে। কাজে-কাজেই তিনি এক দন্ত-চিকিৎসককে বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন।

শহরের এক বিখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক এসে হাজির হলেন তাঁর বাড়ীতে। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁত তোলবার সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। দন্ত-চিকিৎসক যখন ভদ্রলোকটির দাঁত তুলতে যাচ্ছেন, ভদ্রলোকটি তখন তাঁর জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে একজন রুস-সেনাপতি তাঁর সাথে দেখা করতে আসছেন।

তখন ভদ্রলোকটি দন্ত-চিকিৎসককে বললেন, "একটু থাম! হ্যাঁ, দেখ বাপু! আমার এই খারাপ দাঁতটিকে ভাল ক'রে চিনে রাখ। পরে যখনি আমি তোমায় ডাকব, তখনি তুমি সেটাকে তুলে ফেলবে। কিন্তু সাবধান! দেখ, সেটি ছাড়া অন্য দাঁতে যেন হাত না পড়ে—খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে কাজ করবে—বুঝলে?"

তারপর ভদ্রলোকটি দন্ত-চিকিৎসককে অন্য এক ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং সেখানে তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে চ'লে এলেন।

এদিকে রুস-সেনাপতি তখন ভদ্রলোকের বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছেন। মুহূর্ত্তমাত্র কালবিলম্ব না ক'রে তাঁর সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ভদ্রলোকটি বাড়ীর বাহিরে গেলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলবার পর পোল-ভদ্রলোকটি তাঁর রুস-অতিথিকে বললেন, "দেখুন সেনাপতি! আপনারা সব

সময়ে এমন ভান করেন যাতে মনে হয় যে, আমাদের চেয়ে আপনারা সম্রাজ্ঞীকে বেশী শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। আমি কিন্তু সে-কথা মোটেই বিশ্বাস করি না। অন্ততঃ আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, আমি আপনার চেয়ে সম্রাজ্ঞীকে বেশী শ্রদ্ধা-ভক্তি করি; যদি বলেন, তা' আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।"

যন্ত্রণাদায়ক দাঁতটিকে তুলে ফেললেন

"কী ক'রে তা' প্রমাণ করবেন?" সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন রুস-সেনাপতি।

"কাজ দিয়ে ক'রে দেখাব, যেটা আপনি করতে পারবেন না"—ভদ্রলোক উত্তর করলেন।

ভদ্রলোক তখনি পাশের ঘর থেকে দন্ত-চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন। হন্ত-দন্ত হ'য়ে তিনি এসে হাজির হলেন।

ভদ্রলোক চিকিৎসককে বললেন, "সম্রাজ্ঞীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমার সর্বোৎকৃষ্ট দাঁতটি উৎসর্গ করতে চাই!—সেটা এখনি তুলে ফেল!"

দন্ত-চিকিৎসক দ্বিরুক্তি না করে ভদ্রলোকটির যন্ত্রণাদায়ক দাঁতটিকে তুলে ফেললেন।

সেনাপতি চিন্তা করতে লাগলেন—ভদ্রলোক নিজ-রক্ত দিয়ে সম্রাজ্ঞীর প্রতি রাজ-ভক্তির চরম নিদর্শন প্রকাশ করলেন—তাঁকেও ত' এক্ষেত্রে হটে গেলে চলবে না। এ ত' প্রকারান্তরে রাজভক্তির এক প্রতিযোগিতা।...এ ত' তাঁর পক্ষে পরাজয়ের সামিল

…এ পরাজয়ের গ্লানি তিনি সইবেন কেমন ক'রে?…পরক্ষণে সেনাপতি চীৎকার করে বললেন, "এই যে চিকিৎসক! এখনি আমার দুটো দাঁত তুলে ফেলুন।"

দন্ত-চিকিৎসক মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে রুস-সেনাপতির সবচেয়ে ভাল দুটি দাঁত উপড়ে ফেললেন।

* *

তারপর সেনাপতির অবস্থা যা' হ'ল আশা করি, তোমাদের আর বিশদভাবে বলার দরকার নেই। কাঁচা-দাঁত যাওয়া যে কি ব্যাপার তা' একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে! এইখানেই প্রতিযোগিতার শেষ আর সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীরও।*

---

* বিদেশী গল্পের অনুবাদ।

● জেনে রাখা ভালো

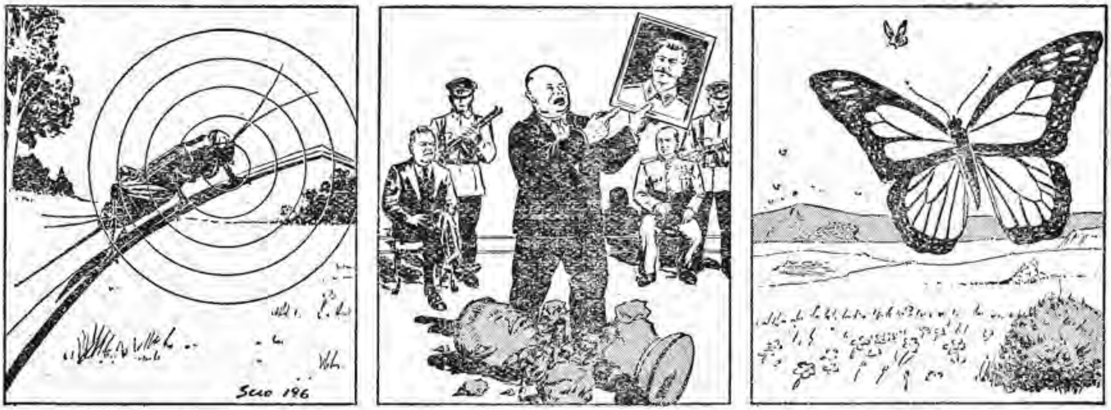

১নং চিত্র। কানই একমাত্র শ্রবণযন্ত্র একথা ঝিঁঝিঁ পোকার বেলা ব্যতিক্রম হয়েছে। ঝিঁঝিঁ পোকা হাঁটুর সাহায্যে শোনার কাজ চালায়। কাজেই আমরা বলতে পারি, হাঁটুই ঝিঁঝিঁর শ্রবণযন্ত্র।

২নং চিত্র। যে-সকল মানুষের মধ্যে কিছুমাত্র শক্তির বিকাশ হয়েছে, যত চেষ্টাই লোকে করুক না, তার গুণ প্রকাশ পাবেই। কিছুকাল আগে স্টালিনের প্রভাব দূর করবার জন্যে রাসিয়ান নেতাদের মধ্যে আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু রুস-নেতা ক্রুসেভ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, কোন কোন ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্টালিন ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ কমুনিষ্ট। এর দ্বারা প্রমাণ হয় স্টালিন ছিলেন শক্তিমান।

৩নং চিত্র। কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। কারণ সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু বিশেষ গুণ আছে। কোন কোন বিষয়ে কীট-পতঙ্গও মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতির কথাই ধরা যাক। এক মাইল দূর থেকে সে তার সঙ্গীর ঘ্রাণ পায়।

ইস্কাবনের টেক্কা

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

[**পূর্ব্বকথা**। অনিতা সেন টাইপিষ্টের কাজ করে সংসার চালাতো। একদিন অফিসের সেক্রেটারী দামোদর ভট্টাচার্য্যির অনুরোধে একটা 'ইস্কাবনের টেক্কা' সে নকল করে দেয়। পরে সে জানতে পারে, ঐ ইস্কাবনের টেক্কা এক ডাকাত-দলের প্রতীক-চিহ্ন! অনিতার সন্দেহ হয় দামোদরের ওপর। কিন্তু পরদিন অফিসে গিয়ে সে শোনে, দামোদরবাবু খুন হয়েছেন।

সহকারী সেক্রেটারী অনিলবাবু এবং আরও দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে অনিতা যায় লাশ সনাক্ত করতে। ফেরবার পথে দুর্ব্বৃত্তের কবলে পড়ে সে। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের জন্যে রক্ষা পেয়ে যায় অনিতা। সাব-ইন্‌স্পেক্টার শৈলেশ যায় তদন্ত করতে—তাকেও আর পাওয়া যায় না। আর ওদিকে অনিলবাবু ও তাঁর সহকর্মী দু'জনেরও কোন পাত্তা পাওয়া যায় না।

পরের দিন ডেপুটি সাহেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল অনিতার। সেখানে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের আবির্ভাব। নাম তাঁর জালেন্ধরওয়ালা। অনিতাকে অবশ্য তিনি দেখতে পান নি। দামোদর ভট্টাচার্য্য যে কোম্পানীর সেক্রেটারী,—সেই কোম্পানীর ডিরেক্টর তিনি। ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একটি খাম দেখালেন ডেপুটিকে। খামখানা খুলতেই ডেপুটি দেখেন…একটা ইস্কাবনের টেক্কা!

পরের দিন ডেপুটি সাহেব নিজের চেম্বারে বসে এই কেসের কথা ভাবছেন। এমন সময় সেখানে শৈলেশ এসে হাজির। শৈলেশের মুখ থেকে অনেক গুপ্ত সংবাদ শুনে ডেপুটি সাহেব তারই উপর এই তদন্তের ভার দেন।

শৈলেশ অনিতার সঙ্গে দেখা করে পূর্ব্বেকার সমস্ত ঘটনা জানে। পরে গভীর রাতে শৈলেশ যায় জালেন্ধর-ওয়ালার কোম্পানীতে। সেখানে দস্যুর কবলে পড়ে যায় সে।

এদিকে অনিলবাবু ফিরেছেন। ডেপুটি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে চাকলাদারকে দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করে ছেড়ে দেন। ডেপুটি অনুমান করেন, শৈলেশ দস্যুদের কবলে পড়েছে।]

নয়

অনিলবাবু সম্বন্ধে বিরূপ আলোচনা অনিতার কানে কিছু আসে নি। সেই জন্যে তাঁকে নিজের বাড়ীর দোরে দেখতে পেয়ে সে বিস্মিত যতই হ'ক, ভয় পেল না; বরং বলা যেতে পারে যে সেদিনকার সহকর্মীকে দস্যুকবল থেকে মুক্ত হয়ে আসতে দেখে খাঁটি আনন্দই সে অনুভব করল খানিকটা।

অনিলবাবুকে আসন দেওয়া হ'ল উপরের সেই তিন ঠ্যাংওয়ালা চেয়ারে। আজকাল আর এ-বাড়ীর আব্রু বলে কিছু নেই। হামেশাই পুলিশ আসছে। তাদের বসিয়ে কথা কইতে হ'চ্ছে দশ বিশ ত্রিশ মিনিট। বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা যথাসম্ভব এ-মহলটাকে এড়িয়ে চলে। বাইরের লোকের, বিশেষ ক'রে পুলিশের লোকের চোখে ভদ্রঘরের কোন মেয়ে সাধ ক'রে পড়তে চায়? অনিতার

মায়ের অবশ্য উপায় নেই। তা' তিনি প্রায় বুড়োর সামিল ; লজ্জাসরম জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হয় নি।

অনিলবাবু আসন গ্রহণ করেই বললেন—"সেদিন শ্যামবাজার-মোড়ে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর অনেক কাণ্ড ঘ'টে গেল মিস্ সেন !"

অনিতা মাথা নেড়ে সায় দিল—"আমারও, আপনাদেরও। তা' হীরুবাবু সমরেশবাবু—তাঁরাও ছাড়া পেয়েছেন ত' ? সত্যি সত্যিই ডাকাত তারা, অঁ্যা ?"

"সত্যি সত্যিই যে ডাকাত, এটা হলফ ক'রে বলতে পারি"—জবাব দিলেন অনিলবাবু। "আর হীরুবাবু সমরেশবাবুর কথা যদি বলেন, তাঁরা ছাড়া পেয়েছেন বলে শুনি নি। ডাকাতের হাতে পড়ার পর তাঁদের সঙ্গে আর দেখা হয় নি আমার।"

মাত্র পাঁচ শ' টাকার চেক…

সভয়ে অনিতা বলল—"বলেন কী ?"…

"আর বলি কি! আমিও যে ছাড়া পেয়েছি, সে পাঁচ হাজার টাকা তিন দিনের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেব—এই রকম স্বীকার ক'রে। কী রকম ধড়িবাজ ওরা, জানেন ? সে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটা যে কোথায়, তা' এখনও বলে নি আমাকে। আমায় টাকা যোগাড় ক'রে রাখতে হবে ; তিন দিনের দিন ওরা ঠিকানা জানাবে। এক মিনিটের নোটিসে টাকা নিয়ে বেরুতে হবে আমায় !"—বড় দুঃখেই হেসে ফেললেন অনিলবাবু।

অনিতা কী জবাব দেবে এ কথার ? সে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল অনিলবাবুর দিকে।

অনিলবাবু একবার কাশলেন ; একবার কামানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"টাকার জন্যে গিয়েছিলাম এক আত্মীয়ের কাছে। তাঁরও অফিস আছে একটা। টাকা অবশ্য তিনি সামান্যই দিতে পেরেছেন ;—এই দেখুন না মাত্র পাঁচ শ' টাকার চেক একখানা।"

বলতে বলতেই একখানা চেক পকেট থেকে বা'র ক'রে অনিলবাবু অনিতার সামনে ধরলেন।

পাঁচ শ' টাকার অঙ্কটা অনিতার চোখে পড়ল, আর চোখে পড়ল সাংহাই ব্যাঙ্কের নামটা। সইটা ভাল বোঝা গেল না।

বুঝবার জন্যে অনিতার মাথাব্যথাই বা কী? কে অনিলবাবুকে টাকা দিচ্ছে, কে দিচ্ছে না, তাতে কীই বা তার আসে যায়? মোটের উপর সে অনিলবাবুর ব্যাপারে দুঃখিত। তা', বিপদ ত' অনিতার কম নয়! এই সবে কালকের কথা, তাকে ত' মেরে ফেলারই চেষ্টা হয়েছিল!

অনিলবাবু চেকটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন—"কিন্তু যে-কথা আপনাকে বলতে এসেছি—! আমি নিজের চাকরির কথাই তাঁকে বলেছিলাম; কারণ ইণ্ডো-আমেরিকানের ত' আর কোন আশা-ভরসাই নেই! তা' নিশীথদা আমায় ব'ললেন—'তুমি টাইপ জানলে একটা শ'-খানেকের পোষ্ট তোমায় এক্ষুণি দিতে পারতাম অনিল! টাইপিষ্ট একজন দরকার'।"

উৎসুক ভাবে অনিতা চাইল অনিলবাবুর পানে। টাইপিষ্ট? একশো টাকা? আহা, ঐ চাকরিটা তার হয় না?

"আমার নিজের ত' ও-বিদ্যে জানা নেই!"—অনিলবাবু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—"নিজের যখন হবে না, তখন আপনার যদি একটু উপকার হয়,—অর্থাৎ আপনার কথা তাঁকে বলাতে—তিনি আজই দেখা করতে বলেছেন আপনাকে।"

বুকের ভিতরটা ধ্বক্‌ ক'রে উঠল অনিতার। আজই? আজই দেখা করতে বলেছেন? আজই চাকরিটা হয়ে যেতে পারে?

কিন্তু—

কিন্তু সে বেরোবে কী ক'রে? ঘরের ভিতরেই তার উপর গুলিগোলা চালাচ্ছে যারা, তারা কি আর রাস্তায় তাকে পেলে ছেড়ে দেবে? তা' ছাড়াও, পুলিশের কড়া নিষেধ আছে; ডেপুটি সাহেব নিজে তাকে বলেছেন—কোনমতেই সে যেন বাড়ী থেকে এক পা না বেরোয়।

তার মনের দ্বিধা কি বুঝতে পারলেন অনিলবাবু? একটু হেসে তিনি বললেন—"বিপদ আপনারও চারদিকে, আমারও। এ বিপদ কেটে যাবে একদিন; এ-চাকরিটা কিন্তু ততদিন খালি থাকবে না।"

"না, তা' থাকবে না।" অনিলবাবুরই কথার প্রতিধ্বনি করল অনিতা। "আপনি একটু বসুন, আমি মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।"

মা পাশের ঘরেই আছেন—এটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে অনিলবাবু গলা চড়িয়ে দিলেন এক পর্দা। "আমি যদি একখানা ঘেরা গাড়ী এনে দিই, আপনি তাতে উঠে একাও যেতে পারেন, পাড়ার কোন ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। আমি নিজেই যেতাম আপনার সঙ্গে; কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না; কারণ টাকার ধান্ধায় অনেক জায়গা আমায় ঘুরতে হবে। বুঝতেই ত' পারছেন। পাঁচ হাজারের ভিতর মাত্র পাঁচ শ' যোগাড় হয়েছে।"

একটু বাদেই অনিতা ফিরে এল। বলল—"পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও আমি যাব আপনার সঙ্গে। বিপদ কোথায় নেই? ঘরে ব'সেও ত' ঘটতে পারে সেটা।"

"রাখে হরি মারে কে?"—ব'লে উঠে দাঁড়ালেন অনিলবাবু।

"উঠবেন না এখুনি! আপনি যখন সঙ্গে যেতে পারবেন না, তখন আমি অবিনাশকে নিয়ে

যাব। আমার ছোট ভাই চলে গেছে তাকে ডাকতে। এই গলিতেই তার দোকান; সে আমার জন্যে অনেক কিছু করেছে; আরও সব-কিছুই তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারি আমি।"

অনিলবাবু মাথা নেড়ে ইসারায় জানালেন—এ অতি উত্তম প্রস্তাব। পকেট থেকে কলম বার করলেন—এক টুকরো সাদা কাগজ চেয়ে নিলেন অনিতার কাছ থেকে। খস্‌খস্ ক'রে ছোট্ট একখানা চিঠি লিখে ফেললেন—তাঁর নিশীথদার নামে। "দেখুন"—ব'লে সে-চিঠি অনিতারই হাতে দিলেন তিনি।

"পূজনীয় নিশীথদা,

টাইপিষ্টের কাজটার জন্যে যে-মহিলার কথা বলে এসেছি, তিনি এই যাচ্ছেন আপনার কাছে। এঁকে নিলে আপনার অফিসের কাজ খুবই ভাল চলবে, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। ইণ্ডো-আমেরিকান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমার মত ইনিও বেকার হয়ে পড়েছেন। অথচ এঁর উপার্জ্জনের উপরই একটা সংসার ষোল-আনা নির্ভর ক'রে আছে। আপনাকে বেশী লেখার দরকার আছে ব'লে মনে করি না।

প্রণাম এবং আর একবার ধন্যবাদ জানাই টাকার জন্যে। ইতি

প্রণত—অনিল।

ঠিকানাটি ইংরেজীতে—

শ্রীনিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রুম নং ২৭, তেতলা
রামপুরিয়া ম্যানসন
৭২ চূণাপটী, বড়বাজার।

অনিতা চিঠি পড়ে দেখল। সত্যিই অনিলবাবু লোক ভাল। যেচে এসে চাকরি দেওয়া—এযুগে ক'টা লোক দেয়? তারপর কী দরদ দিয়ে লেখা চিঠিখানি। কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গেল অনিতার অন্তর। অনিলবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে ফালি বারান্দাটুকুতে এসে দাঁড়ালেন, অনিতাও এল তাঁর সঙ্গে। একবার তার মনে হ'ল যে বারান্দায় দাঁড়ানো নিরাপদ নয় তার পক্ষে। পরক্ষণেই নিজেকে সে সাহস দিল—"ভয় কী? শৈলেশবাবু ত' পাহারা মোতায়েন ক'রে দিয়েছেন এ-বাড়ীতে!"

অনিলবাবু রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়লেন।

গলি দিয়ে একখানা গাড়ী যায় ধীরে ধীরে—খালি ট্যাক্সি, তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন—"ট্যাক্সি, ইধার।"

গাড়ী থামল, অনিতার মনে চট্ ক'রে উদয় হ'ল একটা কথা। সে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলল। "আচ্ছা, অনিলবাবু, আমাদের ডিরেক্টর জালেন্ধরওয়ালার সঙ্গে আপনার কোন্ বিষয়ে মিল আছে, আপনি জানেন?"

"জালেন্ধরওয়ালা?—মিল?—আমার সঙ্গে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অনিলবাবু।

"হুবহু মিল। তাঁর আর আপনার গলার স্বর একেবারে একরকম। এমন ধারা মিল আমি আর কোনও দু'জন লোকের ভিতর দেখিনি। তাজ্জব!"

"কিন্তু জালেন্ধরওয়ালাকে আপনি দেখলেন কোথায়? আমিও ত' তাঁকে দু'একবার মাত্রই দেখেছি! তাও দূর থেকে। সত্যি বলতে কি, তাঁর গলার স্বর আমি কোনও দিন শুনেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না।"

"সে ত' সম্ভবই! তিনি ত' আর অফিসে আসতেন না!" অনিতা বিব্রত বোধ করল। অনিলবাবুর কথার সুর থেকে মোলায়েম ভাবটা হঠাৎ উবে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সে আবার ব'লে উঠল—"সে ত' সম্ভবই! তিনি ত' আর অফিসে আসতেন না! সেদিন পুলিশ-অফিসে দৈবাৎ তাঁর কথা শুনি।"

"ওঃ, পুলিশ-অফিসে? সেখানে কী বললেন আপনি?" অনিলবাবুর কথার ভিতর থেকে যেটা ফুটে বেরুলো, সেটা কি নিছক কৌতূহল? না, আর কিছু? অনিতার মনে হ'ল, ঠিক কী যে তার মনে হ'ল, তা' সেই মুহূর্ত্তে ঠিক বুঝেও উঠতে পারল না।

কিন্তু আলোচনা আর বেশীদূর চলল না। ট্যাক্সি দোরগোড়ায় থেমে পড়েছে এসে। অনিতা বলল—"দেরী করলে মীটার চড়বে—অথচ অবিনাশ এখনো—না, না, ঐ যে এসে পড়েছে অবিনাশ। চলুন তা' হ'লে! আমি মা'কে ব'লে আসি একবারটি।"

* * *

লালবাজারের ইনস্পেক্টর বিভূতিবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে একটি বাঙ্গালী যুবক, সাদা পোশাকের পুলিশ। সে বলছে—"অনিলবাবুর পিছনে আমি আর সদানন্দ ছিলাম। নবীন হালদার লেনে অনিতা সেনের বাড়ীতে তিনি গেলেন। তিনি যাবার পর একখানা ঢাকা খালি ট্যাক্সি বার চার-পাঁচ ঐ বাড়ীর সামনে দিয়ে এল আর গেল। আমরা গাড়ী থামিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ড্রাইভার বলল—একটা ঠিকানা খুঁজছে। এক চিরকুট কাগজ আমাদের দেখাল—কী ভাষায় লেখা আমরা বুঝলাম না। লোকটা পাঞ্জাবী বা সিন্ধী বা গুজরাটী বা অন্য কিছু ব'লে মনে হ'ল। গাড়ীর নম্বর বি. জে. ৯২৩৭। গাড়ীটা নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের তখনকার কাজ নয় ব'লে আমরা ঘাঁটাই নি তাকে। তবে বরাবর নজর রেখেছিলাম।

পাঁচবার ঘোরার পর অনিলবাবু গাড়ীটাকে ডাকলেন অনিতা সেনের বারান্দা থেকে। গাড়ী থামল। একটু পরেই একটি যুবককে নিয়ে মিস্ সেন গাড়ীতে উঠলেন। অনিলবাবু উঠলেন না। গাড়ী ছেড়ে গেল। সদানন্দ অনিলবাবুর সঙ্গ নিল। আমি রিপোর্ট দিতে এলাম।"

রামপুকুর থানায় ইনস্পেক্টর ইন্দুবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আর একটি বাঙ্গালী যুবক। সেও সাদা পোশাকের পুলিশ। সে বলছে—"শৈলেশবাবু আমাদের মোতায়েন করেছিলেন অনিতা সেনের বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে। চারজন আমরা, দু'জন দু'জন ক'রে পাহারা দেব। এখন ছিল আমার আর ব্রজমাধবের পালা। অনিতা সেনের বাড়ীতে ঢুকলেন একটি ভদ্রলোক। একটু পরে তিনি বারান্দা থেকে গাড়ী ডাকলেন। অনিতা সেনের ভাইয়ের সঙ্গে এল এক যুবক। সেই যুবককে নিয়ে মিস্ সেন গাড়ীতে উঠলেন। ঐ গাড়ীখানা অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাফেরা করছিল গলিতে। আমরা জিজ্ঞাসা করতে ড্রাইভার বলছিল—একটা ঠিকানা খুঁজছে। কী যেন এক অজানা ভাষায় লেখা একটা চিরকুট দেখায়। লোকটা বোধ হয় দিল্লীওয়ালা বা পেশোয়ারী বা কাশ্মীরী বা অন্য কিছু হবে; গাড়ীর নম্বর বি. জে. ৯২৩৭।

ব্রজমাধব গলির সাইকেলের দোকান থেকে একখানা সাইকেল নিয়ে ট্যাক্সির পিছনে ছুটছে। আমি এসেছি রিপোর্ট দিতে। শৈলেশবাবুকে পাচ্ছি না ব'লে আপনাকে রিপোর্ট দিচ্ছি।"

দু'টি রিপোর্টই অবিলম্বে পৌছাল ভাদুড়ি সাহেবের কাছে। তিনি কপালে দু'টি টোকা মারলেন প্রথমে। তারপর হুকুম দিলেন—সব থানাতে জানানো হ'ক—বি. জে. ৯২৩৭ নম্বর গাড়ী যেখানে পাওয়া যাবে ধরবে।

এক ঘণ্টার ভিতর খবর এল—বি. জে. ৯২৩৭ নম্বর গাড়ী পড়ে আছে চুণাপটির এক অন্ধকার কাণা গলির ভিতর। গাড়ীতে প'ড়ে আছে এক মুমূর্ষু যুবক, তার গায়ে তিন জায়গায় ছোরার আঘাত। অন্য জনপ্রাণী গাড়ীতে কেউ নেই। অনিতা সেনের পাত্তা পাওয়া যায় নি। [ক্রমশঃ

● জেনে রাখা ভালো

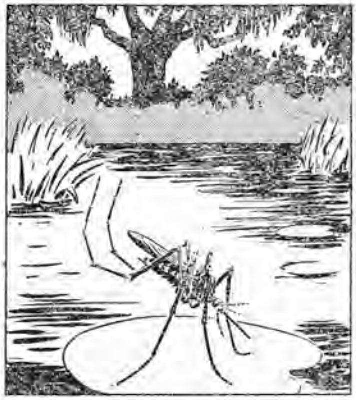

১নং চিত্র। আজকাল মানচিত্র খুবই সুলভ—যেখানে সেখানে কিনতে পাওয়া যায়। স্কুলের ছাত্ররা দরকার হলেই মানচিত্র কেনে। চিরদিন কিন্তু এরকম ছিল না। অতীতকালে পথ-ঘাটের নির্ভুল মানচিত্রের খুবই অভাব ছিল। তাই সেগুলো খুবই গোপনে আর খুবই যত্নের সঙ্গে রাখা হোত। আজকাল আণবিক অস্ত্র-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি খুবই গোপনে রাখা হয়। ঠিক একই কারণে রোমানদের আমলে মানচিত্র খুবই গোপনে রাখা হোত। কেউ নকল করে নিলে তাকে শাস্তি পেতে হোত। বর্ত্তমান কালের আণবিক অস্ত্রের মতই সেকালে মানচিত্রগুলি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ যা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য, কাল তা' হয়ে পড়ে সুলভ। আণবিক তথ্যও হয় ত' একদিন তুচ্ছ হয়ে পড়বে—যেদিন মানুষ আরও উচ্চতর তথ্যের সন্ধান জানবে।

২নং চিত্র। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত—যেখানেই যাও না কেন মশার দেখা পাবে। মরুভূমিই হোক, আর মেরু-অঞ্চলই হোক মশার কামড় থেকে কোথাও রেহাই পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শুধু স্ত্রী-মশারাই মানুষকে কামড়ায়, পুরুষ-মশা কামড়ায় না। এই মশার কিন্তু প্রধান খাদ্য রক্ত নয়—মশার প্রধান খাদ্য হচ্ছে গাছ-গাছড়ার রস।

৩নং চিত্র। আটলাণ্টিক মহাসাগরে পুয়ার্টোরিকো অঞ্চল আমেরিকার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেও নিজেদের খানিক ভার আমেরিকার উপর স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে। পুয়ার্টোরিকোর অধিবাসীরা এখনও সাবালক হয়নি, তাদের কার্য্য থেকে তা' অনুমান করা যায়।

ব্যোম্ ভোলানাথ

—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারি ত' জিনিস ! এই তো কিছুকাল আগেও এক পয়সায় একটা দেশলাই পাওয়া যেত। আজ না হয় দাম বেড়েছে, তা' যতই বাড়ুক, কে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বল ?

কিন্তু দেশলাই-এর ইতিহাস অত সহজ নয় যে, এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবে ! আজকের যে নিরাপদ জিনিসটি (safety match) দেখছ, এর জীবন ইতিহাসের গোড়াপত্তনে, এত নিরীহ নিরাপদ ছিল না। তবে গল্পটা বলতেই হ'ল।

১৭৮১ সালে জন ওয়াকার নামে এক ভদ্রলোক ইংলণ্ডে জন্মেছিলেন। যুবা বয়েসে তাঁর প্রধান শখ আর নেশা, যাই বল—একটা ছিল। সেটি আর কিছু নয়—গাছপালা নিয়ে গবেষণা করা। সময় পেলেই গাছপালার বিভিন্ন ধরণ, তার প্রকৃতি, কোন ফুলের কি রকম গড়ন—এই সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার কাজ খুব ভাল লাগত তাঁর। সাদাসিধে ভাল মানুষ বেচারা ! এক অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তারের কাছে শিক্ষানবিশী করে যা' সামান্য পেতেন তাতেই ছিল তাঁর সন্তুষ্টি। স্টক্‌টন-অন্-টিজ্-এ ছিল তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র। পরে এক ওষুধের দোকানে চাকরিও নিয়েছিলেন ওয়াকার।

যা' হোক, হঠাৎ একদিন ওয়াকার একটা আশ্চর্য্য ফুল দেখতে পেলেন বনে। এমন ফুল সচরাচর কারো বাড়ীর বাগানে ফোটে না। সত্যিই অদ্ভুত ধরণের ফুল। রাতে এ ফুলের পাপড়ি থেকে আলো বেরুত। ফুলে আবার আলো কী করে বার হয় ? খুব ভাবনায় পড়লেন ওয়াকার ! জানতেই হবে এর মূল রহস্য। অনেক চিন্তার পর ওয়াকার স্থির করলেন—কী করে আগুনের সৃষ্টি হয় সেইটেই জানতে হবে সকলের আগে।

এইবার প্রয়োজন হল আগুন সৃষ্টির পরীক্ষার কাজ। লেগে গেলেন ওয়াকার নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষায়। এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে দেখছেন তিনি, কী ফল দাঁড়ায়। এমনি ভাবে আপন খেয়ালে পরীক্ষা করতে করতে সেই "ব্যোম্‌ভোলা" মানুষটি সত্যই একদিন আগুন জ্বালিয়ে ফেললেন।

ক্লোরাইড্ অব্ পটাশ আর সালফাইড্ অব্ অ্যানটিমনি—এই দু'টি মিশিয়ে তার ওপর কোন কিছু দিয়ে ঘষলেই "ফ্যাঁস্" করে জ্বলে উঠত সে আগুন। সেদিনকার পৃথিবীর এইটিই হল প্রথম আগুন সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক উপায়। নাম ছিল তার "Percussion Powder". কিন্তু এ খুব নিরাপদ জিনিস ছিল না। জ্বালাতে গিয়ে

হাত পুড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। ওয়াকার ভাবলেন, আগুন সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবন হ'ল বটে, কিন্তু এ আগুন জ্বালতে হাঙ্গামা অনেক! তাই ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় এল শুকনো কাঠের কথা। তখন শুকনো কাঠ থেকে চেঁচে-ছুলে কাঠি তৈরী করে এই পাউডার তার আগায় লাগিয়ে পাথরের দেওয়াল বা মাটিতে ঘষে আগুন জ্বালানোটা আরও সহজ করে দিলেন। এ ভাবেই তৈরি হ'ল আমাদের প্রথম দেশলাই—এই সভ্য জগতের অগণিত বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের একটি নগণ্য সম্ভাবনা।

১৮২৭ সালে ওয়াকার এই ধরণের দেশলাই নিজে হাতে তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে বেড়াতেন। নাম দিয়েছিলেন দেশলাই-এর—"Strike-anywhere" Friction matches. এতে দেশের লোকের খুব উপকার হ'ল। কারণ তখন টিণ্ডার-বাক্সের (Flint and Tinder Box) যুগ। ধাতু দিয়ে তৈরি একটা বাক্সের মধ্যে পশমী কাপড়-জাতীয় একরকম কাপড়ের টুক্‌রো থাকত। চকমকি-জাতীয় জিনিস ঠুকে—যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হত, সেই স্ফুলিঙ্গ গিয়ে ন্যাকড়ার টুক্‌রোতে লাগত এবং তা' জ্বলে উঠত। তা' থেকে লোকে পেত আগুন।

এই টিণ্ডার-বাক্স আর তার আগুন ধরানোর সরঞ্জামের বড় কম দাম ছিল না। এক শিলিং চার পেন্স খরচ করলে তবে পাওয়া যেত আগুন জ্বালানোর একপ্রস্থ সাজ-সরঞ্জাম! আর আগুন জ্বালো বললেই চট্ করে আগুন জ্বালানো যেত না। খুব কম পক্ষে চার পাঁচ মিনিট সময় লাগত টিণ্ডার-বাক্সে আগুন জ্বালাতে!

ওয়াকারের বন্ধু-বান্ধবরা ওয়াকারকে বললেন, দেশলাই তৈরির তাঁর পদ্ধতিটাকে পেটেণ্ট অফিসে "পেটেণ্ট" নিতে। কিন্তু সহজ সরল মানুষ ওয়াকার সে কথায় কান দিতেন না। তিনি বলতেন, ও আবার একটা ভারি জিনিস! কী দরকার এ সব হাঙ্গামা করে? এটা একটা হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের বেশী কিছু নয়—সেটা ভুললে চলবে না!

কিন্তু দেশের একশ্রেণীর চতুর লোকেরা ওয়াকারের এই আবিষ্কারের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দু'হাতে পয়সা পিটতে লাগল! ছেলে, বুড়ো থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত ম্যাচ্ তৈরি করে দু'পয়সা কামিয়ে নিলে। কেউ কেউ আবার এমন সব নতুন পদ্ধতিতে দেশলাই তৈরি করতে লাগল, যা' নাকি খুবই মারাত্মক। ওর মধ্যে যেগুলো আবার গন্ধক দিয়ে তৈরি, সেগুলো থেকে এমন বিশ্রী ধোঁয়া বেরুত যে নাকে গেলেই কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম! এসব দেশলাই-এর গায়ে সাবধান-বাণীও লেখা থাকত, "যাঁদের ফুসফুস দুর্ব্বল, তাঁরা যেন ভুলেও এ দেশলাই ব্যবহার না করেন!"

কিছুদিন পরে আবার এক ধরণের দেশলাই কাঠি আর একজন বাজারে চালু

করলেন। তিনি গেলেন সকলকে ছাড়িয়ে। তাঁর কাঠির আগায় ফসফরাস দেওয়া থাকত। এই ফসফরাসের দেশলাই-কাঠি এমন মারাত্মক যে, যে-কারখানায় এ ধরণের জিনিস তৈরি হত,—সেখানকার কারিগররা অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। ফরফরাস-ঘটিত রাসায়নিক ধোঁয়ার (Fumes of slowly oxidising phosphorus) গন্ধে তাদের চোয়ালের হাড়ে পচন ধরতে আরম্ভ হ'ল। এরপর আবার আর একরকম আবিষ্কার হ'ল—এ দেশলাই-এ পট্‌কা ফাটার শব্দ করে তবে জ্বলত আগুন! এর পর আবার সালফিউরিক এ্যাসিড্-ঘটিত দ্রব্য দিয়ে তৈরী আর একরকম দেশলাইও দেখা দিল বাজারে। যা' হোক—এ সবগুলোই ছিল মহা অসুবিধের জিনিস, যত শীঘ্র এতে ধরে যেত আগুন তেমনি ঘটত পদে পদে বিপদ! কোন কিছুর ধাক্কা লাগলে বা সামান্য সূর্য্যের আলোর উত্তাপ লাগলে আর রক্ষে ছিল না। প্রায় লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাওয়ার যোগাড়!

দেশলাই শিল্পের ক্রম-বিকাশে যখন এইরকম অবস্থা, সেই সময় ১৮৪৫ সালে লাণ্ডস্টর্ম্ম নামে এক ভদ্রলোক আধুনিককালের দেশলাই (safety match) আবিষ্কার করে ফেললেন! এইটিই হ'ল সবচেয়ে নিরাপদ প্রক্রিয়া। কিন্তু ওদিকে ওয়াকার তখনও তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার করা দেশলাই বিক্রি করে চলেছেন। নতুন এসে তখন পুরাতনের স্থান নিয়েছে, অর্থ-ভাগ্যের যে মহা সুযোগ তিনি পেটেণ্ট না নিয়ে হারিয়েছেন, তা' চিরকালের জন্যে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে! পেটেণ্ট না নিয়েও যদি রয়েলটি হিসেবে কারবারও করতেন তিনি কারো সঙ্গে, তা' হলেও লক্ষ টাকা পেতেন তিনি এ থেকে—একথা বলতে লাগল সকলে। একথা শুনে একটুও অনুশোচনা হল না কিন্তু ওয়াকারের।

সাধক যারা, যারা স্রষ্টা চিরদিন এমনই তারা অসংসারী আর বোকা—ব্যবসা-বুদ্ধি থাকে না তাদের। ভগবান চৌকোস করে কাউকে তো গড়েন না—ওয়াকারকেও গড়েননি।

* * * * *

সেদিনের পরম বিস্ময় দেশলাই-এর একটি কাঠি অতি তুচ্ছ নগণ্য জিনিস আজকের দিনে আমাদের কাছে! ওয়াকার সে দিন একে "অতি তুচ্ছ" করেছিলেন বলেই কী আমাদের মনের অগোচরে এই ভাব সংক্রামিত হয়ে আছে? এই কথাই মনে পড়ে কেবল। আর ওয়াকার? দেশলাই আবিষ্কারের আদিগুরু তিনিও বোধহয় হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলতলে অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য হয়ে! যেন—ভারি ত' জিনিস দেশলাই—তার আবার আবিষ্কারক! কে তাঁর কথা মনে রাখে? কে মনে রাখে সেই ত্যাগী নির্লোভ "ব্যোম্ ভোলানাথে"র কথা!

হাতী শিকার

—শ্রীসুজিৎ বাগচি

কিছুদিন আগেকার কথা বলছি। তখন আমি আমার কাঠের ব্যবসার জন্যে দক্ষিণ ভারতের মালাবার জঙ্গলে ছিলাম।

মালাবার জঙ্গল খুব বড়। নানারকমের বন্য পশু এখানে পাওয়া যায়, কাজেই বুঝতেই পারছ যারা শিকার ভালবাসে তাদের পক্ষে এরকম জঙ্গল কেমন লাগে? আমি নিজে যদিও কোনদিন শিকার করিনি, কিন্তু শিকার-দলের সঙ্গে যেতে ভাল লাগত। কেন না শিকারের সবচেয়ে বড় মজা হল এতে যথেষ্ট উত্তেজনা আছে—আর তা' ছাড়া গভীর জঙ্গল বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। আমি যে দলে গিয়েছিলাম সেই দলে আসল শিকারী ছিল তিনজন—মিঃ জন লরেন্স বলে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, সুব্বিয়া রমণ বলে একজন মাদ্রাজী জঙ্গল ঠিকেদার; আরেক জনের নাম আমি ভুলে গেছি কিন্তু সেও বেশ ভাল শিকারী ছিল এবং মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার লোক ছিল। আর তাছাড়া সাঙ্গোপাঙ্গ হিসাবে দশ পনের জন কুলি ছিল। তাদের ভিতর এরেইয়া বলে বেশ বড় দরের একজন শিকারীও ছিল।

এই যে এরেইয়া বলে যে কুলিটি ছিল, তার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। কুলিটি ছিল পেশাদার শিকারী। দক্ষিণ মালাবার থেকে সে এসেছে। এর আগে একটা শিকার-দলের সঙ্গে গিয়ে সে একটা হাতীর দলের তিন-চারটে হাতী মেরেছিল। সর্দ্দার হাতীটাকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু গুলি তার বাঁ কানের পাশে ঢুকে গিয়েছিল বলে হাতীটা সেই যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল। যাবার সময় লোকটি যেতে খুব ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু শিকারের নেশায় যে পাগল হয়ে আছে, সে না যেয়ে থাকতে পারবে কেন? ফলে ঠিক যাবার দিন সে এসে আমাদের দলে যোগ দিয়েছিল।

আমরা ত' এক শীতের রাতে একটা জীপে করে যাত্রা করলাম। জঙ্গলের-বেশ কনকনে ঠাণ্ডা আমার গরম জামা-কাপড় ভেদ করে ঢুকছিল। একটা পাহাড় পার হয়ে বেশ কিছুদূর যাবার পর এরেইয়া গাড়ী থামাতে বললে। আমরা গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়লাম। সেই জায়গাটা একটু সমতল মতন। অত্যন্ত গভীর জঙ্গল। এরেইয়া বলল, এখানে একটা পুকুর মতন আছে। আশে পাশের জীবজন্তুরা এখানে জল খেতে আসে। আমরা গাড়ীটাকে বেশ করে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে দিলাম এবং চাকার সঙ্গে একটা লম্বা ও মোটা লোহার চেন দিয়ে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে চললাম। সেই জলাশয়টার কাছে এসে তিন শিকারী তিনটে দূরবর্ত্তী গাছে উঠে বসল। আমি সুব্বিয়া রমণের সঙ্গে ছিলাম। আর কুলিরা কিছু দূরে বন্য জন্তুর অপেক্ষায় ছিল।

আকাশে সেই সময় একটুখানি চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো যদিও আমাদের গায়ে এসে পড়ছিল না, কিন্তু তবুও আমরা বেশ ঢেকেঢুকে বসেছিলাম। মিঃ লরেন্স ও অপর শিকারী অন্য গাছে ছিল, কিন্তু তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। চুপচাপ আমরা বসে আছি। কিছুক্ষণ পরে, তা' প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, কুলির দল তিনবার শব্দ করেই একেবারে আকাশ ফাটানো রবে মাদল-জাতীয় ঢাক ঢোল বাজাতে লাগল। বুঝলাম হাতীর পাল এসে পড়েছে। কুলিদের শেখানো ছিল যে হাতীর পাল এলে তারা যেন ঐ ভাবে শব্দ করে।

কিছুক্ষণ পরে দেখি জঙ্গলের একটা দিক—ভিড়ের রাস্তায় দমকল গেলে যেমন রাস্তার মাঝখানটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যায়—তেমনি জঙ্গলের মধ্যে গাছগুলো কাত হয়ে যাচ্ছে। নিচে অন্ধকারের জন্যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তারপর ওদিকের মিঃ লরেন্সের গাছের কাছ থেকে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেই সঙ্গে একটা হাতীর করুণ অথচ বিকট স্বরে আর্তনাদ ভেসে এল। ইতিমধ্যে জলাশয়ের ধারে কয়েকটা হাতী এসে জমা হয়েছে। একটা হাতী একেবারে আমাদের বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক হঠাৎ দুম্ করে একটা গুলি ছুঁড়ে দিল তার ডবল ব্যারেল রাইফেল থেকে। কি হল বুঝতে পারলাম না, দেখি একটা হাতী আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ হাতীটা মোড় ঘুরল, ঘুরেই যে গাছটাতে এরেইয়া বসেছিল সেটার দিকে যেতে লাগল। আমরা ভাবলাম বুঝি আমাদের ফাঁড়া কাটল, কেন না আমার সঙ্গী ভদ্রলোকের এভাবে ঝুঁকি নিয়ে মারা মোটেই উচিত হয়নি। তারপর একটু খস খস শব্দ শুনছি। আমাদের গাছটার থেকে এরেইয়ার গাছটা হাত বিশেক দূর হবে না। আমি

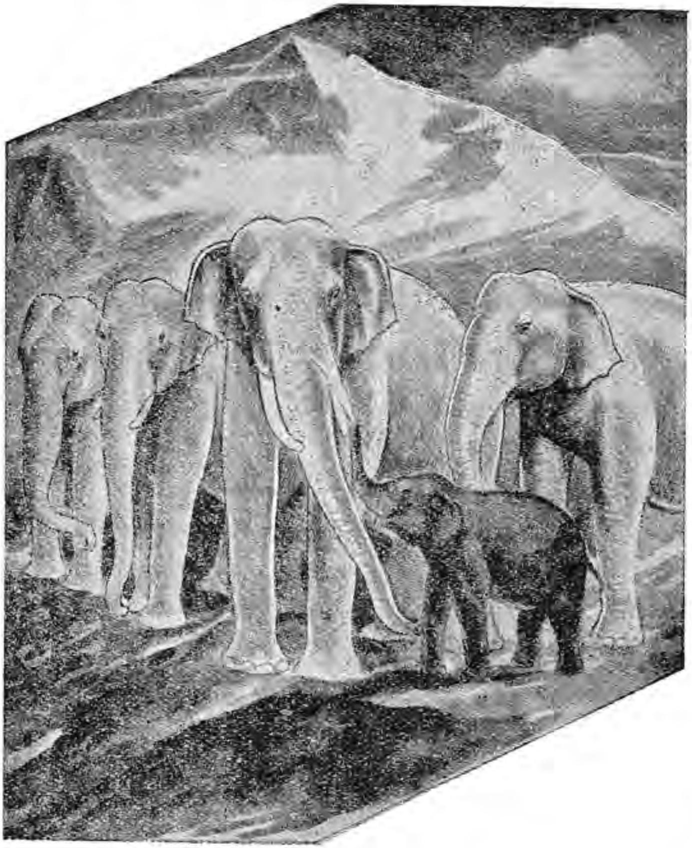

কয়েকটা হাতী এসে জমা হয়েছে।

স্পষ্ট দেখলাম হাতীটা শুঁড় দিয়ে এরেইয়াকে ধরবার চেষ্টা করছে। আর এরেইয়ার গাছটা মোটেই উঁচু না হওয়ায় সে এ ডাল থেকে ও ডাল সে ডাল থেকে এ ডাল করছে।

কিছুক্ষণ এইরকম চলল। যদিও একজনের পক্ষে বিপদ, কিন্তু এরকম লুকোচুরি খেলা বেশ লাগছিল। কিন্তু পরে যা' দেখলাম তাতে বেশ মুস্কিল মনে হল। দেখলাম হাতীটা গাছটাকে ঠেলতে আরম্ভ করেছে। ঐ অতবড় বন্য জন্তুর রাগ গাছটা ঠেকাতে পারবে কেন? গাছটা মড়মড় করতে করতে ভেঙ্গে গেল, এরেইয়া যে ডালটার উপর ছিল সেটা ছিল উঁচু—হাতীর নাগালের

বাইরে। কিন্তু গাছটা ভেঙ্গে পড়ায় সে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল! তারপর পড়ে যাওয়ার জন্যে পা মচকে বা ভেঙ্গে যাওয়ায় সে কোনরকমে লেংচে লেংচে দৌড়াতে লাগল। মুখে অবশ্য তার একটুও শব্দ নেই, হাতীটাও তাই দেখে তাকে তাড়া করেছে, ঐ হাতীটার দেখাদেখি অন্যান্য হাতীরাও তাকে ধাওয়া করেছে।

ইতিমধ্যে আমরা চারজন গাছ থেকে নেমে পড়লাম। বাদবাকী কুলির দল তারা তখন অবিশ্রান্তভাবে ড্রাম পিটিয়ে যাচ্ছে। হাতীর পিছন পিছন আমরাও ছুটে চলেছি, এবং অন্যান্য হাতীগুলো পেরিয়ে আমরা সর্দার হাতীটার কাছাকাছি যখন এসে পড়লাম তখন দেখলাম এরেইয়া আর হাতীর দূরত্ব হাত দশেক মাত্র। হাতীটা চেষ্টা করছে তাকে শুঁড় দিয়ে ধরবার, কিন্তু পারছে না। এই সময় এরেইয়া আমাদের দেখতে পেয়ে গুলি করতে বলল খুব চিৎকার করে তাদের ভাষায়। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক একটা গুলি ছুঁড়লেন ঠিক সেই হাতীটার কান লক্ষ্য করে, কিন্তু হাতীটাকে একটুও কাত হতে দেখলাম না। একসময় হাতীটা এরেইয়াকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল এবং এরেইয়ার একটি গগনবিদারী আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছাড় মারল। কেবল তাই নয় কাছের একটা ডাল ভেঙ্গে এনে সেটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফের সেটা দিয়ে আঘাত করল— আমরা বেশ দেখতে পেলাম। এরেইয়ার শরীরের ভিতর থেকে গলগল করে রক্ত বার হচ্ছে। হাতীটা এতেও ক্ষান্ত হল না। তার দাঁত দিয়ে সে বেশ কিছু মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত্ত করল। তারপর এরেইয়ার দেহটা শুঁড় দিয়ে তুলে এনে সেই গর্ত্তটার মধ্যে রাখল এবং ফের মাটি চাপা দিয়ে সেটা বুজিয়ে দিল।

আমরা হঠাৎ এই ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখতে দেখতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম; হাতীটা আমাদের দলের দিকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। দেখতেই আমরা নিজের নিজের অবস্থা বুঝতে পারলাম এবং চারজনেই দৌড় দিলাম। দেখতে দেখতে চারজনের গতি চাঁরমুখ হল। দেখলাম হাতীটা আমার সঙ্গী মাদ্রাজী ভদ্রলোকের দিকে তাড়া করল। কেন না সে বেশ বুঝতে পেরেছিল গুলিটা কার নল দিয়ে বার হয়েছিল। হাতীটা বেশ কিছুদূর যাবার পর আমার খেয়াল হল যে আমি ভুল পথে ছুটছি। আমি সেখান থেকে যতদুর জোরে সম্ভব চিৎকার করে সঙ্গী ভদ্রলোকদের ডাকলাম—এবং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিল। সেই সাড়া যেদিক থেকে এসেছে, সেইদিক লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম এবং অপর দুইজনের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করতে করতে একজায়গায় তিনজনে মিললাম।

সেখান থেকে ফের আমরা যাত্রা করলাম। বুঝতে পারছিলাম না ওরা কোন রাস্তায় গেছে। তবুও আমরা জঙ্গল ভেদ করে এগুতে লাগলাম। ঘণ্টা দুই তিন ঘুরলাম। প্রায় মাইল সাত আট ঘুরবার পর দেখতে পেলাম—ইতিমধ্যে ভোর হয়ে গেছে। আমরা যে জায়গায় ছিলাম সে জায়গাটা একটু ঢালু মতন। সেই ঢালু জায়গাটার মধ্যে দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। আর রেললাইনের একটা জায়গায় একটা আর্চ্চ টাইপের ব্রিজ আছে—যদিও ব্রিজ না বলে সেটাকে কালভার্ট বলা ভাল। তার ভিতর দিয়ে একটা লোক হামাগুড়ি দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ যেতে পারে। সেইখানে দেখলাম হাতীটা সেই কালভার্টের এক দিকের মুখ যত রাজ্যের পাথর, ডালপালা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে এবং অন্যদিক দিয়ে মিঃ রমণকে ধরতে চেষ্টা করছে। যখন দেখছে শুঁড়ের নাগালের মধ্যে নেই তখন

অন্য দিক দিয়ে এসে পাথরগুলো কিছু কিছু ঠেলে দিচ্ছে এবং ফের অপর দিক দিয়ে শুঁড় দিয়ে ধরতে চেষ্টা করছে।

মিঃ লরেন্স বললেন যে, মিঃ রমণ বোধ হয় ওর ভিতর আছে, তাই হাতীটা তাকে ধরতে চেষ্টা করছে ঐ ভাবে। আমরা ঠিক করলাম হাতীটাকে মারতে হবে। কিন্তু পাছে হাতীটা আমাদের দেখতে পায় সেজন্যে একটু দূরে গিয়ে হাতীটার কাছাকাছি এসে গেলাম। হাওয়া আমাদের প্রতিকূলে বইছিল বলে হঠাৎ হাতীটা মুখ তুলে তাকাল এবং আমাদের দেখতে পেল, কিন্তু তার দেখা ঐখানেই শেষ হল। কেন না আমার সঙ্গী দুই ভদ্রলোকের দুই রাইফেল থেকে ততক্ষণ দুটো গুলি বার হয়ে গেছে এবং দুটো গুলিই একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যে হাতীটার কপালে গিয়ে লেগেছে! হাতীটা ঐ অবস্থাতেই আমাদের দিকে ছুটে আসছিল এবং আবার পরপর দু'টি গুলিতে সে বিরাট শব্দের সঙ্গে সেখানে ধরাশায়ী হল।

আমরা যখন মিঃ রমণকে টেনে বার করলাম তখন উত্তেজনা, পরিশ্রম ও ভয়ে তার অর্দ্ধমৃত অবস্থা!

● জেনে রাখা ভালো

১নং চিত্র। স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা মানুষের চেয়ে কোন কোন প্রজাপতির অনেক বেশী। ২০০ ভাগ জলের সঙ্গে এক ভাগ শর্করা মিশ্রিত হলে মানুষ মিশ্রিত জলের মিষ্ট আস্বাদ লাভ করে। তার কম হলে পারে না। স্বাদ গ্রহণে মানুষের এই শেষ সীমানা। ৩০০,০০০ ভাগ জলের সঙ্গে এক ভাগ শর্করা মিশ্রিত থাকলে কোন কোন প্রজাপতি মিষ্টস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। এই থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন শক্তির তারতম্য আছে। সেইজন্য কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

২নং চিত্র। বেল টেলিফোন রসায়নাগারের বৈজ্ঞানিকেরাও এক ধরণের সচিত্র টেলিফোন আবিষ্কার করেছেন। সেই যন্ত্রে যারা কথা বলে, তাদের ছবি পাশে অবস্থিত একটি পর্দ্দায় ফুটে উঠে। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ওদেশে প্রায়ই অদ্ভুত যত জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে। বস্তু জগতে ওরা যত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে ততই পতন-ভীতি ওদের ত্রাসের সৃষ্টি করছে। ভাবছে এটম বোমার সাহায্যে সেই পতন তারা আটকাবে—যেমন দৈহিক শক্তির দ্বারা গ্রীস-রোম পতন আটকেছিল, আর এখন ফ্রান্স-ইংলণ্ড আটকাচ্ছে।

৩নং চিত্র। ঐকান্তিক ইচ্ছা শক্তির দ্বারা জগতে কিছুই করা অসম্ভব নয় তার প্রমাণ সাইবেরিয়ার দীর্ঘ ২৫০০ মাইল লম্বা রেলপথ। দিবারাত্রি পরিশ্রম করে, তুষার-ঝঞ্চা অগ্রাহ্য করে, সুখ-সুবিধা পদদলিত করে—রাশিয়ায় এই দীর্ঘ রেলপথ স্থাপিত হয়েছে।

ভারতের রত্ন

—অলককুমার ঘোষ

গ্রামের শেষে মাঠ। সেখানে বুড়ো বটগাছের তলায় সেদিন পড়ে বেদেদের ছাউনী। প্রায় প্রতি বছরই তারা এ গ্রামে আসে। কিছুদিন থাকে—লোকেদের খেলা দেখিয়ে রোজগার করে। তারপর চলে যায় অন্য দেশে।

এই মাঠের ভেতর দিয়েই হাটে যাবার পথ। তারই ধারে ছিল এই বুড়ো বটগাছটা। পাঁচ-ছ'টা গ্রামের ছেলেরা এই পথেই দু'বেলা ইস্কুলে যাতায়াত করত। তাই বেদেরা পছন্দ করত এই জায়গাটা। মুখে মুখে পাঁচ-ছ'টা গ্রামে তাদের আগমন-বার্ত্তা রটে যেত একদিনেই।

সেদিন ছিল শনিবার। হাটবার—সকাল থেকেই তাই সে পথে লোকের আনাগোনার শেষ নেই। ন'টা বাজতে না বাজতেই ছোট বড় ছাতা মাথায় দিয়ে পাততাড়ি বগলে নিয়ে ছেলেরা ইস্কুলের অভিমুখে যেতে সুরু করে। সকাল থেকেই বেদেদের খেলা সুরু হয়েছে। ডুগ্ ডুগ্ করে ঢোল বাজছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কখনো সাপের খেলা, কখনো বা ভালুকের খেলা, আর কখনো বা চলেছে ম্যাজিকের খেলা। মাঠ থেকে এক মুঠো ধুলো খেলোয়াড় হাতে তুলে নিল। বিস্মিত জনতার চোখের সামনেই মুহূর্ত্তের মধ্যে মুঠো খুলতে দেখা গেল ধুলো রূপান্তরিত হয়েছে একমুঠো চালে। করতালির সঙ্গে অদূরে সাজিয়ে রাখা থালার ওপর দর্শকেরা পয়সা দিয়ে চলেছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ও বাড়ে। হঠাৎ একটি দশ-বারো বছর বয়সের ছেলে তারই বয়সী আর একটা ছেলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, "ওরে প্রতুল, ইস্কুলে যাবি না? সাড়ে দশটা যে বেজে গেল! দেরী হলে হেডমাষ্টার মশাই পিঠে বেত ভাঙ্‌বেন যে!"

চমকে উঠে প্রতুল বলে, "না ভাই, আজ আর যাব না—কেমন সুন্দর খেলা দেখাচ্ছে দেখ্! আমি শেষ অব্দি না দেখে এখান থেকে নড়ছি না।"

—"সেকি রে! তোর মার খাবার ভয় নেই? যদি হেড্স্যার জানতে পারেন, তাহ'লে আর আস্ত রাখবেন না! তারপরে কেউ যদি তোর বাবাকে ব'লে দেয়? তাহ'লে কি হবে?"

—"দিক গে বলে! আমি ভয় করি না।"

প্রথম ছেলেটি স্কুলের পথে চলে যায়, আর প্রতুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে থাকে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ভীড়ের সঙ্গে মিশে সে নিজের বাড়ী চলে যায়। বই

খাতা নিজের ঘরে গুছিয়ে রেখে অন্যদিনের মত প্রতুল আজ আর খেলতে যায় না—খাটে শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে থাকে, সে যদি একজন বেদে হত—তাহ'লে ঐ খেলোয়াড়টার মত খেলা দেখিয়ে সে কত না পয়সা রোজগার করতে পারত! সকলে তার খেলা দেখে ধন্য ধন্য করত।

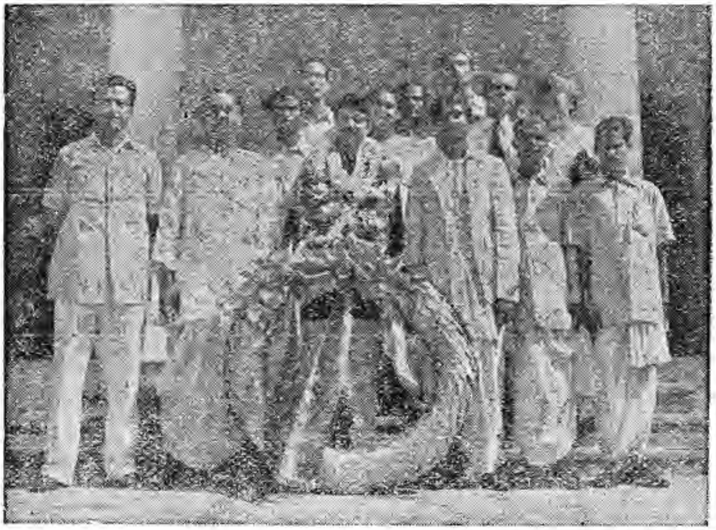

জার্মানীর বিজয়মালা "গোল্ডেন নরেল" জয় করে ভারতে ফিরলে বিমান-ঘাঁটিতে যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়

ছেলেকে খেলা করতে যেতে না দেখে মা এসে ঘরে ঢোকেন।—"কি রে খোকা, খেলতে গেলি না? শরীর ভাল আছে তো?"

—"হ্যাঁ মা, ভাল আছে। আজ আর খেলতে যেতে ইচ্ছা করছে না।"

—"কেন রে?"

—"মা, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলছি। বকবে না বল? আমি আজ ইস্কুলে-যাইনি মা।"

—"তবে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

—"ঐ বুড়ো বটগাছটার তলায়। ওখানে একদল বেদে এসেছে। তারা আজ থেকে খেলা দেখাচ্ছে। ওদেরই খেলা দেখছিলাম। মা, আমি যদি ঐরকম খেলা দেখাতে পারতাম, তা' হলে বেশ হত, না মা মণি?"

ছেলে বেদেদের মত খেলা দেখাতে শিখবে, একথা শুনে মা তো বিস্মিত হয়ে যান। কিন্তু তাকে কিছু বলাও চলে না। সত্যি কথা বলেছে—নিজের দোষ নিজে স্বীকার করেছে। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিয়ে মা বলেন,—"বেদে কেন বাবা! তুমি মস্ত বড় যাদুকর হবে! কিন্তু তার আগে তোমাকে তো লেখাপড়া শিখতে হবে। লেখাপড়া না শিখলে তুমি তো বড় যাদুকর হতে পারবে না!"

মা প্রথমটা ভেবেছিলেন, এ বুঝি তাঁর খোকার মনের সামান্য একটা উত্তেজনা। ক'দিন পরে ছেলে ভুলে যাবে বেদেদের কথা—ভুলে যাবে যাদুবিদ্যার কথা। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচজন ছেলের মতই সে গতানুগতিক পথেই চলবে। সেদিন-কার কথা যে ভবিষ্যতে সত্য হয়ে উঠবে, তা' অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউই জানতেন না।

সেদিন থেকে প্রতুলের মধ্যে দেখা যায় এক পরিবর্ত্তন। দিন-রাত সে ভাবতে থাকে, কেমন করে সে বড় যাদুকর হবে। শিব-মন্দিরের ভাঙা রোয়াকটায় বসে সে কতদিন তার ভবিষ্যতের যাদুকরের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্কুল থেকে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সে বেদেদের অনুকরণে খেলা অভ্যেস করতে আরম্ভ করেছে। আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজেই বলে,—"লাগ্‌, ভেস্কি লাগ্‌···লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌! দেখে যাও বাপু ভানুমতীর খেল্‌!"

বাবার কাছে আব্দার ধরে সে একটা যাদুবিদ্যার বই কিনে নিয়েছে। তখনকার দিনে আজ-কার মত যাদুবিদ্যার বইও পাওয়া যেত না। একখানি ইংরেজী বই কতবার সে পড়েছে···তার প্রতিটি খেলা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অভ্যেস করেছে। স্কুলে কোন বিশেষ দিনে আজকাল সে ম্যাজিক দেখিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য করে দেয়।

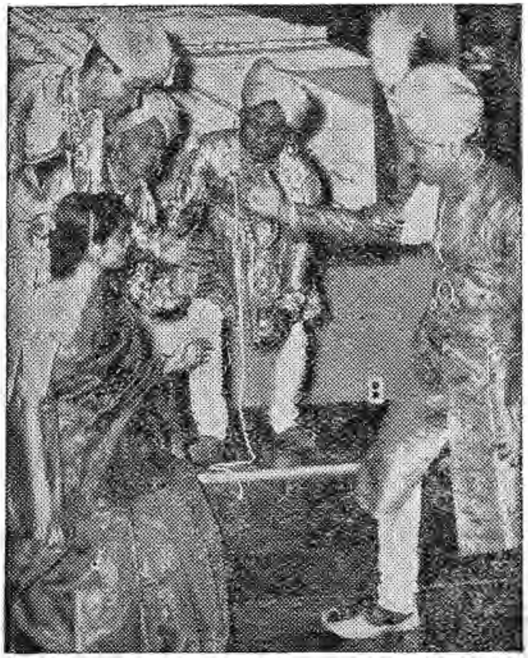

ভারতীয় দড়ির খেলা আজও বিশ্বের বিস্ময়!
যাদুসম্রাট দলবলসহ নিউ ইয়র্কে পৌঁছোলে বিমান-ঘাঁটিতেই
তিনি দড়ির খেলার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখাচ্ছেন

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সে ঢোকে ময়মনসিংয়ের আনন্দমোহন কলেজে। বাবা জিজ্ঞেস করেন, "প্রতুল, কি পড়বি? আর্টস্‌ না সায়ান্স্‌?"

তৎক্ষণাৎ প্রতুল উত্তর দেয়,—"সায়ান্স্‌।"

প্রতুলকে যে সায়ান্স্‌ পড়তেই হবে। কারণ সে সামান্য যাদুবিদ্যা অভ্যেস করেই বুঝতে পেরেছে যে উন্নত ধরণের ম্যাজিক দেখাতে গেলে বিজ্ঞান জানা একান্ত আবশ্যক।

কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তার যাদুবিদ্যার সাধনা। কেমিষ্ট্রী আর ফিজিকস-এর সাহায্য নিয়ে সে আবিষ্কার করে নানা উন্নত ধরণের খেলা। কলেজের

কমনরুমে ছেলেদের দেখিয়ে বিস্মিতও করে দেয় সকলকে। এইভাবে ১৯৩৩ সালে অঙ্কেতে অনার্স নিয়ে সে বি, এস-সি পাস করে।

বাবা বলেন,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে তুমি, এইবারে একটা কাজ খুঁজে নাও। সংসারের অবস্থা তো তুমি বোঝ ?"

প্রতুল আসে ভাগ্য-পরীক্ষা করতে কলকাতায়। মেসে থেকে সে কলকাতায় কাজ খুঁজতে থাকে। কাজ খোঁজার চেয়েও তার লক্ষ্য থাকে, কেমন করে সে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে। তখনকার দিনের বিখ্যাত যাদুকর গণপতিবাবু ও রাজা বোসের সঙ্গে সে পরিচিত হয়। মন দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে তাঁদের খেলার প্রতিটি পদ্ধতি। কেমন করে তাঁরা দর্শকের মন জয় করেন। খুব শীঘ্র প্রতুলও একটি দল করে। খেলা দেখাবার জন্যে একটা দিনও স্থির করে। বহু দর্শকের সামনে গ্রামের প্রতুল আজ প্রথম খেলা দেখাবে।

সকাল থেকেই চলে তোড়জোড়। হঠাৎ প্রতুল খবর পায়, কলকাতার একজন বিখ্যাত যাদুকর প্রতুলের এই খেলায় উপস্থিত থেকে তার সকল যাদুবিদ্যার কৌশল দর্শকের সামনে দর্শক-হিসেবে ধরে দেবেন।

প্রতুল ভাবতে থাকে কেমন করে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ? হঠাৎ প্রতুলের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়। সেই ম্যাজিসিয়ানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তুলে দেয় গভর্ণমেন্টের একখানি চিঠি। সেই চিঠিতে যাদুকরকে গভর্ণর হাউসে ডাকা হয়েছে শীঘ্র একটি খেলার বন্দোবস্ত করবার জন্যে। সময় দেওয়া আছে, সন্ধ্যা সাতটায়।

ওদিকে ছটা থেকে প্রতুলের খেলা আরম্ভ হয়ে শেষ হবে রাত্রি আটটায়। সন্ধ্যা ছটায় প্রতুলের কৌশলে যাদুকর যাত্রা করেন গভর্ণর হাউসের দিকে। অবশেষে তিনি প্রতুলের চাতুরী বুঝতে পারেন। খেলার শেষে তিনি প্রতুলকে জড়িয়ে ধরে বলেন,—"মনে করেছিলাম, এ লাইনে তোমাকে আসতে দেব না। কিন্তু তোমার কৌশলের কাছে আমিও আজ পরাজিত। তুমি সামান্য যাদুকর হবে না প্রতুল, ভবিষ্যতে তুমি হবে যাদুসম্রাট্ !"

প্রথমটা কলকাতায় বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে প্রতুল চলে যায় চীনে খেলা দেখাতে। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ প্রায়ই খালি পড়ে থাকে। দু'-একদিন পর প্রতুল বুঝতে পারে, এভাবে খেলা দেখালে তার যাত্রা জয়যুক্ত হবে না। কিন্তু কি করে সে সফলতা লাভ করবে ? হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, তার আদর্শ ছিল, তার দেশের অর্দ্ধনগ্ন বেদেরা—যাদের খেলা দেখাতে ষ্টেজ বা সাজ-সজ্জা কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

এমন সময় একদিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরুল, যাদুকর প্রতুলচন্দ্র সরকারকে পুলিস রেলের লাইনের সঙ্গে তাঁর হাত-পা বেঁধে রাখবেন। এই বাঁধা হবে হংকং

এক্সপ্রেস আসবার ঠিক ছু'মিনিট আগে। এই বন্ধনের ফলে যদি সরকারের মৃত্যু হয়, তার জন্যে কেউ দায়ী থাকবে না।

খেলার দিন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বহু দর্শক উপস্থিত হলেন। পাঁচ মিনিট আগে পুলিসের সঙ্গে যাদুকর সরকারও সেখানে উপস্থিত হন এবং লাইনের সঙ্গে বাঁধবার আগে পুলিসের হাতে একটি কাগজে সই করে দেন। তা'তে লেখা ছিল "এই খেলা দেখাইতে গিয়া যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্য কেহই দায়ী থাকিবে না। এই খেলা দেখাইতে কেহই আমাকে প্ররোচিত করিতেছে না। সজ্ঞানে এবং স্ব-ইচ্ছায় আমি এই খেলা দেখাইতেছি।"

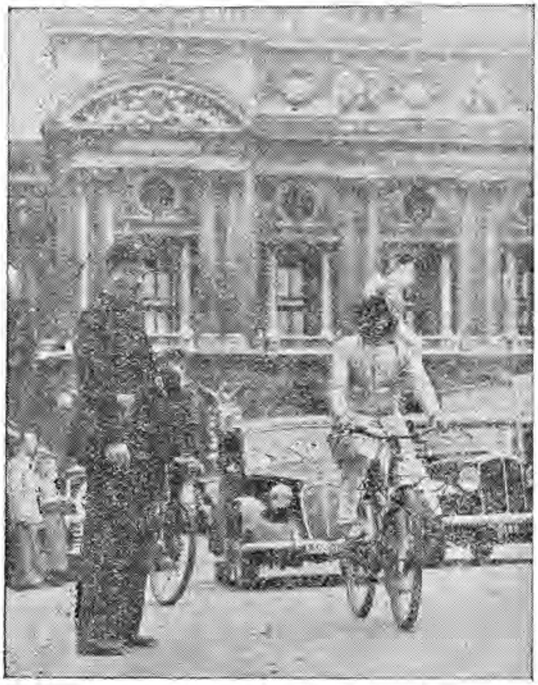

দিব্যদৃষ্টি—
প্যারিসে—১৯৫০ সালে জনবহুল রাজপথে অবিরাম চোখ বাঁধা অবস্থায় সাইকেল চালিয়ে যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার এক নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি করেন

ট্রেণ আসার ঠিক ছু'মিনিট আগে লোহার চেন্ দিয়ে সরকারকে লাইনের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারও ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। প্রথমে ইঞ্জিনের সার্চ্চলাইটটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। পরে একচক্ষু দৈত্যের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হংকং মেল তীর বেগে ছুটে আসতে থাকে। বিরাট জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সরকারের ভাগ্যে কি ঘটে তাই দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন!

ক্রমশঃ লাইনের ওপর ট্রেণের শব্দ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সরকার তখনও ঠিক তেমনি স্থিরভাবে লাইনের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন—বাঁচবার কোন উপায়ই তাঁর আর নেই।

এঞ্জিন ক্রমশঃই কাছে আসছে। তারপরই খট্ খট্ খটা-খট্ শব্দ করে বিরাট হংকং মেলটা জনতার চোখের সামনে দিয়ে নিজের গন্তব্যস্থানে চলে যায়।

সকলে ভাবে বাঙালী যাদুকর আর ইহলোকে নেই। এমন একটা অপঘাত মৃত্যুর জন্যে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিন্তু ট্রেণটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জনতাকে বিস্মিত করে দিয়ে হাত-পা খোলা অবস্থায় সরকার অভিবাদন করেন সেই বিরাট জনতাকে। জয়-ধ্বনি পড়ে যায় জনতার মধ্যে।

আমেরিকায়—এবারে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল রাজপথ নিউইয়র্কের টাইমস্ স্কোয়ারে অবিরাম চোখ বাঁধা অবস্থায় সাইকেল চালিয়ে যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার তাঁর পূর্ব্ব রেকর্ড অক্ষুন্ন রাখেন

এরপর থেকেই সরকারের জয়যাত্রাও সুরু হয়। প্রতিটি সংবাদ-পত্রে তার পরের দিন সরকারের ছবি ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। তাঁর অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশলের কথা সবিস্তারে ছাপা হয় প্রতিটি সংবাদপত্রে। দর্শকেরা ভেঙে পড়ে প্রেক্ষাগৃহে সরকারের খেলা দেখবার জন্যে।

এইভাবে চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, বার্মায় একে একে সরকারের জয়যাত্রা ঘোষিত হয়। ভারতবর্ষে ফিরে এলে তাঁর দেশবাসী আনন্দের সঙ্গে তাঁর খেলা দেখে।

দেখতে দেখতে মহাযুদ্ধ এসে পড়ে। যুদ্ধ শেষও হয়। যুদ্ধ শেষে সরকার যান ইউরোপে। এখানে খেলায় নূতনত্ব ছিল। আমাদের দেশে রাস্তায় বেদেরা যে খেলা দেখায়, সেই খেলা গিয়ে উঠল ইউরোপের ষ্টেজে। স্রেফ্ হাত-সাফাইয়ের কাজ। ওদেশের লোক তো একেবারে বিস্মিত। এও কি কখনো সম্ভব? মানুষ কি এত তড়িৎ গতিতে বিনা যন্ত্রের সাহায্যে কখনো হাত-সাফাই করতে পারে? ধন্য ধন্য পড়ে যায়। সেদিনকার যাদুকর সরকার ইউরোপবাসীদের মতে হলেন শ্রেষ্ঠ যাদুকর। কিন্তু এখনো পৃথিবী বুঝি জয় হয়নি! বাকি আছে সুদূর আমেরিকা। সরকার চলেন আমেরিকার পথে। ভাবতে থাকেন, ইউরোপেতে তিনি যে যশ অর্জ্জন করেছেন, তা' বজায় রাখতে গেলে আমেরিকায় তাঁকে এক নতুন খেলার অবতারণা

করতে হবে—যে খেলা দেখে আমেরিকাবাসী তাঁকে যাদুসম্রাট্ বলে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

আমেরিকায় নেমে তিনি প্রচার করলেন, দর্শকের চোখের ওপর একটি রমণীকে করাত দিয়ে কেটে দ্বিখণ্ডিত করবেন। আবার কিছুক্ষণ বাদে সেই দ্বিখণ্ডিত দেহকে তিনি দর্শকের চোখের সামনেই জোড়া দেবেন।

এই বীভৎস খেলা দেখবার জন্যে প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে পড়ে রাতের পর রাত। আর সরকারও আনন্দের সঙ্গে এই খেলা দেখিয়ে যেতে থাকেন। আমেরিকান ম্যাজিসিয়ান দল স্বীকার করে নেন, পি. সি. সরকার জগতের যাদুসম্রাট্। তিনিই একমাত্র যাদুকর—যিনি আমেরিকা থেকে দু'বার যাদুবিদ্যার নোবেল প্রাইজ "দি ফিনিক্স এওয়ার্ড" লাভ করেন।

জার্ম্মানীতে—জার্ম্মান পরিভ্রমণকালে জার্ম্মানীর যাদুসংস্থার সভাপতি কার্ট ভক্ম্যান যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকারকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করেন

আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে ফ্রান্সে নেমে যাদুসম্রাট্ ঘোষণা করলেন, চোখে কাপড় বেঁধে জনবহুল রাজপথ দিয়ে তিনি সাইকেল চালিয়ে যাবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে চোখে পুরু প্লাষ্টার এঁটে নিয়ে সরকার সাইকেলে ওঠেন। রাস্তার দু'ধারে উত্তেজিত জনতা তাঁকে উৎসাহ দিতে থাকে। একহাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে অপর হাতে তাদের অভিবাদন করতে করতে সরকার নিজের গন্তব্যপথে এগিয়ে যান।

এরপরে জার্ম্মানী থেকে তাঁকে স্বর্ণ লরেল মাল্য উপহার দেওয়া হয়। সারা পৃথিবীর সম্মুখে ভারতীয় যাদুবিদ্যা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করেন বাঙালী যাদুকর যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার।

দেশ-বিভাগের পর তাঁর দেশ পড়ে পাকিস্তানে। দেশের বাড়ী ছেড়ে চলে আসেন তাঁর বৃদ্ধ পিতা, মাতা, আর নাবালক ভাই। দেশ-বিভাগের আগে তিনি যা' কিছু রোজগার করেছিলেন, তার বেশির ভাগই খরচ করেছিলেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমির জন্যে! আবার নতুন করে তাঁর জীবন সুরু হয়। এবার খুব শীঘ্রই কলকাতায় জামির লেনে তিনি বাড়ী করেন। সখ করে বাড়ীখানার নাম দেন "ইন্দ্রজাল"।

ছেলেদের জন্যে বাঙলায় বহু ম্যাজিকের বই তিনি লিখেছেন। তিনি বাল্যকালে নিজের জীবনে যে অভাব বোধ করেছিলেন, তাঁর দেশের ছেলেরা সে অভাব যেন কোন দিন বোধ না করে। এছাড়া বহু দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা বের হয়। তার মধ্যে 'শুকতারা'র পাঠক-পাঠিকারা তাঁর অতি প্রিয়! পৃথিবীর যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, শুকতারার সঙ্গে তিনি নিয়মিত সম্বন্ধ রাখেন। তার প্রমাণ তোমরা প্রায়ই তাঁর লেখার মধ্যে পেয়ে থাক। কিছুদিন পূর্ব্বে এক আমেরিকান টেলিভিশান কোম্পানী প্রায় সত্তর হাজার টাকা খরচ করে মাত্র পনেরো মিনিটের খেলা দেখাবার জন্যে তাঁকে আমেরিকায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। টেলিভিশানের চুক্তি শেষ হলে জনতার বিশেষ অনুরোধে তিনি আবার প্রেক্ষাগৃহে খেলা দেখান। চোখ বেঁধে রাজপথে সাইকেল চালান। চোখের সামনে থেকে হাতী আর মোটর গাড়ী অদৃশ্য করে তিনি জনতাকে বিস্মিত করে দেন।

দেশে ফিরে এসেই আবার নিউজিল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে তিনি গত ১৪।৭।৫৭ তারিখে খেলা দেখাবার জন্য নিউজিল্যাণ্ড রওনা হয়ে গেছেন। সরকারের অধ্যবসায় প্রতিটি বাঙালী ছেলের কাছে শিক্ষণীয় বস্তু।

● জেনে রাখা ভালো

১৯৫৬ সালে সংযুক্ত জাতি-পরিষদের বাৎসরিক কেতাবে দেখা যায়, প্রতি মিনিটে সারা পৃথিবীতে ৮৩টি লোক বাড়ছে, আর ঘণ্টায় বাড়ছে ৫,০০০। এই হারে ক্রমান্বয়ে লোক বেড়ে গেলে এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীতে জন-সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর জন-সংখ্যা ২৭৭,৭০০০,০০০। সত্যই কখনও যদি ঐ অবস্থা হয়, পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তার আগে অন্য গ্রহে বসতি সুরু হলে ভয়ের কারণ নেই।

ভয় কিসের ?

—মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার

বন্ধুগণ !

আমরা মরেছি !

কেন যে মরেছি তা' তোমরা জান না বোধ হয়। যদিও বা জান—তবে ভাল করে জান না বলব। কেন না তোমরা মোটেই ভেবে দেখ না। এই ভেবে না দেখার ফলে আমরা কিছুই ভাল করে জানি না। যদি ভেবে দেখ, তবে বুঝতে পারবে যে ভয়ের জন্যে সত্যিই আমরা মরছি! আজ বাঙ্গালী মরণের পথে চলেছে। এই মরণের পথ একমাত্র বন্ধ করতে পারে কে জান ?

—তোমরা। তোমরাই হচ্ছ দেশের আলো। তোমাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তোমরা যদি দেশকে না দেখ তবে দেখবে কে—বলতে পার ?

আমি জানি অনেকেই বড় বড় বুলি মুখে আওড়ায়—কিন্তু কাজের সময় সব পেছিয়ে যায়। এই সব চোখে দেখেছি। বুঝে দেখবার সময় পেয়েছি। তাই বড় বড় বুলি দিয়ে কাউকে উৎসাহ দিই নি বা পথ দেখাই নি। তাই ভয় না করে নিজের পথে একলা বেরিয়ে পড়েছি দেশ-বিদেশ দেখে বেড়াবার জন্যে।

আমার মনে একটা কথা গেঁথে আছে। সে কথাটি হচ্ছে মানুষ যা' করতে পারে, তা' আমি পারব না কেন। নিশ্চয় পারব। তবে প্রত্যেকের ভিতর একটা শক্তির সীমা আছে। সে সেই সীমার বাইরে যেতে পারে না। প্রত্যেকেই এখন যদি উঠে পড়ে লাগে তবে বলতে পারি যে সে একটা না একটা কিছু নিশ্চয় করতে পারবে। পারব না বলে হতাশ হলে চলবে না। যেখানে সাহস আছে—সেখানে কর্ম্মফল আছেই। সত্যি কি না, ভেবে দেখ।

ধর—যখন আমি বক্সিং লড়তাম, তখন মন থেকে ভয় দূর করে দিতে পেরেছিলাম বলেই দেশ-বিদেশে গিয়ে বক্সিং লড়তে পেরেছি। তোমাদের কাছে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি।

১৯২৬ সাল খুব সম্ভব। শ্রীবলাই চ্যাটার্জ্জি তাঁর দলবল নিয়ে এক মঞ্চে বক্সিং দেখাচ্ছেন। চোখ দিয়ে দেখলাম। আরও দেখলাম যে আমার এক পরিচিত বন্ধু বক্সিং লড়ছে। জানি না আমার মনে কেমন একটা বক্সিং লড়বার সখ জাগল। আমিও ওদের দেখাদেখি হাত পা নাড়তে লাগলাম নিজের খেয়াল মাফিক। তখন আমার বয়স ১৩ বছর মাত্র।

একদিন এক মঞ্চে বক্সিং হবে শুনতে পেলাম। সেখানে গেলাম দেখতে। খুব ভিড় হয়েছে। মন নেচে উঠল—যদি একবার বক্সিং লড়তে দেয়। গিয়ে বললাম যে আমি বক্সিং লড়তে চাই। তারা রাজি হল। কিন্তু কার সঙ্গে লড়ব। জ্যাকি (যতীন চক্রবর্তী) বলে একজন বলাই চ্যাটার্জ্জির ছাত্র আমার সঙ্গে লড়তে রাজি হন। খুব লড়লাম। খুব হাততালি পেলাম। ভাবলাম খুব লড়েছি। কিন্তু তখনও জানি না যে বক্সিং কি ভাবে লড়তে হয়। ভয় করিনি বলেই সে দিন লড়তে পারলাম।

তারপর আমার শিক্ষা হয় শিশির বসুর কাছে। তখন বয়স্কাউটে ছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু অজয় ভোস তখন শিক্ষক রেখে বক্সিং শিখত। আমার পয়সা ছিল না বলে কেবল দেখতাম। তবে সাহস করে একদিন লড়লাম অজয়ের সঙ্গে। দেখিয়ে দিলাম যে সাহস থাকলে কি না হয়। তারপর যখন স্কাউটদের বক্সিং শেখাবার বন্দোবস্ত হয়, তখন শিশির বসুর কাছে হাতে খড়ি হয়। মাঝে মাঝে শিশির বসুর ছাত্রদের সঙ্গে লড়তাম। আমার সাহস আর কায়দা দেখে অনেকেই ভালবাসত।

১৯২৭ সালে বক্সিং শিখি। পরে আর সুবিধা হয় নি। তবে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে শিশির বসু শেখাতে আরম্ভ করলেন যখন তখন আবার যেতে আরম্ভ করলাম ঠিকমত।

১৯২৮ সালে প্রথম বক্সিং প্রতিযোগিতায় যোগদান করি। শ্রীজগৎ কান্ত শীল ছিলেন প্রথম বাঙ্গালী বক্সিং প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা। অনেক বাঙ্গালীর ছেলে কৃতিত্ব দেখাল। আমি ফাইন্যালে উঠে হেরে গেলাম জগন্নাথ ঘোষের কাছে। শীল মহাশয় আমায় খুব তারিফ করলেন।

তখন গ্লাভস না থাকার জন্যে তেমন অনুশীলন করি নি। তবে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে প্রতিযোগিতায় লড়েছিলাম। পর পর দু'দিন জয়লাভ করার পর হাতের পেশী এত কঠিন হয়ে গিয়েছিল যে, হাত নাড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এরপর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পি. এল. রায়ের ছাত্র বীরেন দাস। সে আমার সহপাঠী। একসঙ্গে ছোটবেলায় পড়তাম ক্যালকাটা একাডেমীতে। খুব সুন্দর লড়ত। আমি তার লড়াই দেখেছি। ভাবলাম যে ওর সঙ্গে পারব না। কেন না ও আমার চাইতে অভিজ্ঞ।

৺ ক্যাপ্টেন পি. কে. গুপ্ত—যিনি ব্যায়ামবীর ছিলেন—তিনি আমায় উৎসাহ দিলেন। কিন্তু হাতের অবস্থা দেখে শীল মহাশয় আমায় অন্য দলে নামিয়ে দিলেন। সেখানে এক হাতে লড়ে হারলাম জগা ঘোষের কাছে। কিন্তু আমি দমি নি। পূরো দমে অনুশীলন করতে লাগলাম।

১৯২৯ সালে আমি আমার দলবল নিয়ে নামলাম। কারণ তখন আমি গ্লাভস যোগাড় করে এনে শেখাতাম বন্ধুদের। এই সময় বলাইদা আমার বক্সিং দেখে আমায় বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতেন। ঐ বছরে বাঙ্গালীদের এক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয় পি. এল. রায়ের প্রযোজনায়। সেখানে বলাইদা'র ছাত্র সুধীর মুখার্জ্জির কাছে পরাজিত হই। তারপর ভবানীপুরের পোড়াবাজারের এক কার্নিভ্যালের মাঠে বক্সিং প্রতিযোগিতা হয়। পি. এল. রায় ছিলেন তারও উদ্যোক্তা। এখানে সাহেব বাঙ্গালী সকলেই যোগদান করেছিল।

সাহেবদের হারিয়ে হারিয়ে ফাইন্যালে উঠি। সেখানে আবার বীরেন দাস। এবার আর ভয় করি নি। জানি ও খুব ভাল লড়তে পারে, তবে আমারও মনের জোর এসে গিয়েছিল সাহেব আর্ম্মেনিয়ানদের হারিয়ে। দু'জনে খুব লড়লাম। তিন রাউণ্ড লড়াই হল। সমান সমান হওয়াতে আবার আর এক রাউণ্ড লড়াই হল। তাতে আমাকে হারতে হয়। কেন তা' জানি না।

তারপর থেকে পি. এল্. রায় আমার সব কয়টি প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দিতেন। তার সম্মান রেখেছিলাম—আর বাঙ্গালীর 'ভেতো' আখ্যাটি দূর করেছিলাম।

বন্ধুবর সন্তোষ দে তখন বক্সিং লড়ত। পি. এল. রায় তার গুরুদেব। দু'জনে আমরা অনেক প্রতিযোগিতায় সাহেবদের হারিয়েছি। ১৯৩৪ সালে আমায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল সুদূর ব্রহ্মদেশে পেশাদারী হয়ে লড়াই করতে। এর জন্য সন্তোষ দে কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

আমাকে লড়তে হল ব্রহ্মদেশের সেরা চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা ইয়ং গাউডির সঙ্গে। সে খুব নামজাদা শক্তিশালী মুষ্টিযোদ্ধা। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় আমার খুব ছবি বার হল। লড়াইয়ের দিন ৺ জাষ্টিস এন. সেন আমায় খুব উৎসাহ দিলেন রিংয়ের কোণে এসে। এমন কি একজন লোক দিলেন যাতে আমায় 'সেকেণ্ড' বা সাহায্য করতে পারে।

ঘণ্টা বাজল। মা'কে ডেকে নিলাম মনে মনে। দেহমনে এক অপূর্ব্ব শক্তি জেগে উঠল। বাঙ্গালী যে ভীরু নয়, তা' দেখাতে চাই তাই এগিয়ে গেলাম করমর্দ্দন করতে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। আরম্ভ হল লড়াই। দর্শকরা সব দাঁড়িয়ে উঠেছে। চারদিক চুপচাপ। কেন না, ওদের গাউডি আমার দু'হাতের ঘুসির কাছে বার বার পেছিয়ে পড়ছে। এমন মার দিয়ে চলেছি যে জীবনে অমন ভাবে মার খায় নি। আমি তখন নিজেকে ভুলে গেছি। কেবল মার দিয়ে চলেছি। এক মুহূর্ত্তের জন্যে দাঁড়াতে দিই নি! যেখানে গেছে সেখানে এগিয়ে গিয়ে পিটেছি।

আবার ঘণ্টা বাজাল। বিশ্রাম নেওয়া হল ১ মিনিট। তখন আমার মনে এত সাহস এসে গিয়েছে যে তা' বলবার নয়। মনে হল ওকে নক আউট করবই। মনে কি আনন্দ!

দ্বিতীয় রাউণ্ড সুরু হল। তীব্রবেগে আক্রমণ করলাম। একটা ঘুরিয়ে ঘুসি মারতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে যাই। তাড়াতাড়ি আবার যেই দাঁড়াতে গেছি—সেই সময় অন্যায়ভাবে গাউডি আমায় ঘুসি মারল। মাটীতে হাত নামিয়ে দিতে হল। আবার যেই উঠতে যাচ্ছি—অমনি মারছে।

এমনি ভাবে পাঁচবার আমায় মেরেছে। উঠে দাঁড়াতে দেয় নি। এটা নিশ্চয় অন্যায়। কেউ কিছু বলল না। আমি জানি যে যদি কোন মুষ্টিযোদ্ধা পড়ে যায়—তাকে আগে দাঁড়াতে দিতে হয়। সেই সময় প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। যতক্ষণ না রেফারী লড়তে বলে ততক্ষণ লড়তে পায় না। কিন্তু ব্রহ্মদেশের নিয়ম অতটা জোরালো ছিল না। তাই আমাকে উঠতে দিচ্ছিল না। না দাঁড়াতে পারলে লড়ব কি ভাবে ?

মনে পড়ে গেল বলাই চ্যাটার্জ্জির উপদেশ। তিনি বলেছিলেন যে পড়ে গেলে টপ করে দাঁড়িয়ে উঠতে নেই। ১০ সেকেণ্ডের একটু আগে দাঁড়াতে হয়। ৭।৮ সেকেণ্ডের ভিতর মাথা ঠিক করে নিতে না পারলে ভালভাবে লড়াই করা যায় না। তাই ৯ সেকেণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠলাম। আমি তখন নিজেকে সামলে নিয়েছি।

চারদিকে তখন উত্তেজনা। গাউডিকে সকলে উৎসাহ দিচ্ছে। রেফারী এগিয়ে এসে বলল যে, আমি লড়তে পারব না। কেন না ১০ সেকেণ্ডের পরে দাঁড়িয়েছি। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—বিচার দেখে। কিন্তু দর্শকরা আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগল। কেননা, ওদের সেরা মুষ্টিযোদ্ধা গাউডি জীবনে অমন প্রচণ্ড আঘাত আর কখনো পায় নি। ৺ জাষ্টিস সেন এসে আমায় খুব তারিফ করলেন।

পরের দিন আমার খুব জয়গান করল প্রতিটি সংবাদপত্র। কয়েকখানি পত্রিকা কিনে

নিয়ে এলাম। কেটে কেটে খাতায় লাগিয়ে রাখলাম যাতে দেশে ফিরে দেখাতে পারি যে, বাঙ্গালী ভীরু নয়। বাঙ্গালী লড়তে জানে।

এত গেল একটা লড়াইয়ের ঘটনা। আজ পর্য্যন্ত সাহসের জোরে অনেক কিছুই আমি করেছি। সে সব ঘটনা পরে বলব—যদি জানতে চাও। কেমন করে বিনা পয়সায় গেলাম আমেরিকায়—কিভাবে আমায় আমেরিকার গভর্ণমেন্ট বন্দী করতে গিয়ে হার মানল—কি ভাবে দেশের ছেলেদের বিলেতে আনিয়ে কাজ পাইয়ে দিয়েছি—কি ভাবে দেশ-বিদেশ ঘুরেছি বিনা পয়সায় তা' আমার জানাবার ইচ্ছা রইল। অবশ্য কি ধরণের অ্যাডভেঞ্চার তোমরা ভালবাস—তা' জানতে চাইলে—আমি নিশ্চয় জানাব।

আমার অভিজ্ঞতা—আমি পেয়েছি অপরের কাছে শুনে—কাগজে পড়ে। তারা যদি করতে পারে আমি পারবো নিশ্চয়—এই হল আমার মনের জোর। লোকে কি বলবে, তা' আমি শুনি না। আমি জানি যে আমায় বাঁচতে হবে। তবে ভয়ে মরে বেঁচে কোন লাভ নেই। মরতেই হবে যখন—তখন ভয় কিসের! নিজের মনে বিশ্বাস রাখ। মনে রেখ যে তোমাদের উপরে এক মাথা ছাড়া আর কিছুই নেই। খুব করে মাথাকে ভাবিয়ে তোল—দেখবে অনেক কিছুই পাবে। ভয় কর না। ভয়ই পঙ্গু করে রাখে। কি বল? *

লেখাটি লণ্ডন থেকে প্রেরিত।

জেনে রাখা ভালো

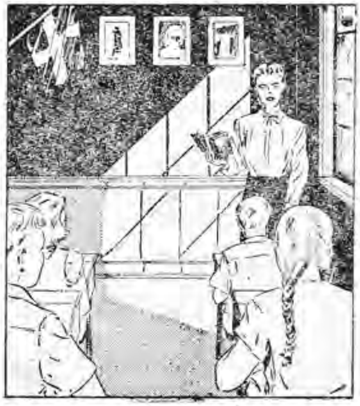

১ নং চিত্র। গত ৩৫ বছর রাসিয়ার শ্রমিকরা নিয়মিতভাবে বছরে দু'সপ্তাহ থেকে এক মাসের মাহিনা দেশের কল্যাণকল্পে সরকারকে ধরে দিয়ে আসছে। ওদেশের শ্রমিকদের মনে নেতারা যে দেশাত্মবোধ জাগিয়েছে, সেই রকম দেশাত্মবোধ এদেশে শ্রমিকদের মনে জাগালে, এদেশ খুব তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে অগ্রসর হত। যাতে দেশ উন্নতির পথে যায় সেদিকে সাধারণতঃ দেশের নেতাদের দৃষ্টি নেই। কেবল নিজের দল কি করে সরকারী ক্ষমতা লাভ করবে, কেবল সেইদিকে দৃষ্টি।

২ নং চিত্র। 'অরিটেন' নামে দশজনে একসঙ্গে চালাবার একটা বাইসিকেল আছে আমেরিকায়। এই অদ্ভুত সাইকেলটি তৈরী হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। লম্বায় এটি ২৩ ফুট। ওজন ৩০৫ পাউণ্ড। ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ছোটে। অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত কীর্ত্তি!

৩ নং চিত্র। বর্ত্তমান জগতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুইডেনের খুব নাম না থাকলেও আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় তারাই সব থেকে অগ্রগামী। হাজার করা একজন মাত্র সেখানে লিখতে পড়তে পারে না।

সাধনার জয়

--রবিদাস সাহা রায়

মানস সরোবরের ধারে কীসের এত ভীড়! দেখতে দেখতে ভীড় আরো বেড়ে গেল। শোনা গেল এক বিধবার করুণ বিলাপ—বাছারে, আমায় ছেড়ে কোথায় গেলি রে!

কৌতূহলী জনতা এগিয়ে গেল। বিধবার একমাত্র সন্তান সাত বছরের ছেলেকে সাপে কেটেছে। পল্লীর লোকেরা ছেলেটিকে খুব ভালবাসত। তারাও দুঃখ করতে লাগল—আহা, কি সোনার ছেলে মারা গেল গো! এমন মাতৃভক্ত ছেলে হয় না।

এমন সময় এক সাধু এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। লম্বা চওড়া চেহারা—কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ্। তাঁকে দেখে বিধবা যেন আঁধারের মাঝেও আলো দেখতে পেল। ছেলেটিকে সাধুর পায়ের কাছে রেখে কেঁদে কেঁদে বলল—বাবা, তুমি ছাড়া কেউ আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। তুমি একে বাঁচাও।

সাধু খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন মরা ছেলেটির দিকে। তারপর ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশ্চর্য্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি চোখ মেলে চাইল। বেঁচে উঠল বিধবার নয়নের মণি। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। কে এই সন্ন্যাসী? কোন যোগীপুরুষ না ছদ্মবেশী দেবতা?

কিন্তু ভীড়ের মাঝে কখন হারিয়ে গেলেন সাধু। কেউ তাঁকে আর দেখতে পেল না।

কত দেশ ঘুরে ঘুরে সেই সাধু আস্তানা গাড়লেন কাশীতে। বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছেই কোনপ্রকারে এক আশ্রম তৈরী করে সেখানে রইলেন। কিন্তু কি খেয়ালী সাধু! কাপড়-চোপড়ের দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই। ন্যাংটো হয়েই থাকেন।

এক মারাঠী স্ত্রীলোক প্রতিদিন যায় বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজো দিতে। স্বামী তার মরণাপন্ন—কিছুতেই রোগ সারছে না। তাই বিশ্বনাথের মন্দিরে রোজ পূজো দেয়। যাতায়াতের পথে সে দেখতে পায় সাধুকে। দেখে তার ঘেন্না হয়। একদিন নাক সিটকিয়ে বেশ কয়েক কথা শুনিয়েই সে সাধুর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সেদিন রাত্রেই স্ত্রীলোকটি স্বপ্ন দেখল। কে যেন তাকে বলছে—তুই দেবতার ভক্তকে ঘৃণা করেছিস, তোর মনের ইচ্ছা পূরণ হবে কি করে?

পরের দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই স্ত্রীলোকটি চলল সেই সাধুর কাছে। তাঁর হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। আশ্চর্য্য, সাধুটি সব কিছু ক্ষমা করলেন। হাতে

এক মুঠো ভস্ম নিয়ে বললেন—নে, তোর স্বামীর গায়ে মেখে দিস্, সব রোগ ভাল হয়ে যাবে।

সত্যি, সেই ভস্ম মেখেই স্ত্রীলোকটির স্বামী ভাল হয়ে গেল। এই ঘটনায় স্ত্রীলোকটি লাভ করল এক নূতন শিক্ষা। কাউকে ঘৃণা করতে নেই। কাউকে ছোট ভাবতে নেই। কোন্ ক্ষুদ্র জিনিসের ভেতর কি মহান্ বস্তু লুকিয়ে আছে কে জানে ?

এই সাধুও তো একদিন ক্ষুদ্র ছিলেন। ছোট শিশু হয়েই জন্ম নিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক জমিদার-বংশে। সে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা।

পিতা নৃসিংহধর, জননী বিদ্যাবতী। সংসারে কোন কিছুর অভাব ছিল না। কাজেই ছেলের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু দিনে দিনে হল কি ! একটু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে সংসারী বিষয়ে অমনোযোগী হয়ে উঠলেন। গরীবদের দুঃখ দেখলে ভয়ানক কাতর হয়ে পড়েন। মানুষের রোগ জরা দেখলে তাঁর মনে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয়। বাপ মা কত চেষ্টা করলেন সংসারে তাঁর মন বেঁধে রাখতে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

পিতার মৃত্যুর পর একদিন তিনি সত্যি বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে—জমিদারির এত সুখ-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে। কত দেশ, কত তীর্থ পর্য্যটন করলেন। দলে দলে লোক তাঁর শিষ্য হতে লাগল।

জীবনের ব্রত সফল করবার জন্যে অদ্ভুত সাধনায় ব্রতী হলেন সেই সাধু। দুঃসহ শীতে শীতল জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে লাগলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তপ্ত বালুকার উপর শয়ন করতে লাগলেন খালি গায়ে। কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন—কোন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখে তোমরা অবাক হয়ো না। মানুষ সাধনা করলেই আশ্চর্য্যজনক কাজ করতে পারে।

কেউ তাঁকে বিশ্বাস করত। কেউ করত অবিশ্বাস। একদিন তাঁর এক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করল—প্রভু, তুমি ভগবানকে দেখেছ ?

সাধু জবাব দিলেন—হ্যাঁ দেখেছি।

ভক্ত প্রশ্ন করল—আমাকে দেখাতে পার ?

সাধু বললেন—বেদীর উপর ছোট কালীমূর্ত্তি আছে, দেখে আয়। ভক্ত দেখে এসে বলল—ঐ মূর্ত্তি দেখে কি হবে ?

সাধু বললেন—তা' হলে চুপ করে বসে থাক্।

ভক্ত চুপ করে বসে রইল। সাধু চোখ বুজে ধ্যান করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বেদীর সেই মূর্ত্তি কুমারী বালিকার মত বেশ ধরে এসে দাঁড়াল সেখানে। ভক্ত অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

মানুষ সাধনা করলে জয় একদিন তার হবেই। এই সাধুর জীবনেই রয়েছে তার প্রমাণ। তাঁর ছিল একাগ্র সাধনা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি। তাই রোগ জরা মৃত্যুকেও তিনি জয় করেছিলেন। ২৮০ বছর বেঁচেছিলেন এই সাধু। কল্পনা করতে পার? একদিনের জন্যেও তাঁর কাছে রোগ ঘেঁষেনি।

তোমরা অবাক হয়ে ভাবছ—কে এই আশ্চর্য্য সাধু—কে এই মহাপুরুষ? বাপ মা তাঁর নাম রেখেছিলেন তৈলঙ্গধর আর গুরুদেব রেখেছিলেন গণপতি স্বামী। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে তিনি সকলের কাছে হয়ে উঠেছিলেন মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী।

● জেনে রাখা ভালো

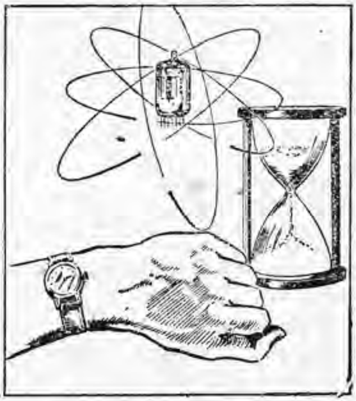

১নং চিত্র। মথ জাতীয় প্রজাপতির আকার ক্ষুদ্র হলেও তাদের অবজ্ঞা করা চলে না। ৬টি মথের বাচ্চার দল সারা বছরে যত খায় তার পরিমাণ একটি ঘোড়ার ওজনের সমান।

২নং চিত্র। রাসিয়ার আর এক নাম লৌহ-যবনিকার দেশ। যাঁরা সেদেশে গেছেন, তাঁদের চোখে লৌহ-যবনিকা অবশ্য ধরা পড়েনি। দেশ থেকে পালালেই, নাগরিকদের সম্মুখে লৌহ-যবনিকা পড়ে বলে পলাতকদের বিশ্বাস। তখন যবনিকার অন্তরালে কত কি ঘটে বলে অপপ্রচার চলে। অপপ্রচারে সত্য চাপা থাকে না। দোষ-ত্রুটি থাকলেও সেদেশের যে অদ্ভুত উন্নতি হচ্ছে একথা প্রচারকারীরাও অন্তরে অন্তরে জানে!

৩নং চিত্র। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সময় নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করে আসছে। তাই কখনও সে সৃষ্টি করেছে, সূর্য্য-ঘড়ি, কখনও বা বালুকা-ঘড়ি। এইভাবে পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষের চেষ্টার ফলে আজকের দিনের ঘড়ির সৃষ্টি। পাঁচ হাজার বছরের সাধনার ফলে নির্ভুলভাবে সময় ঠিক করবার ঘড়ি তৈরী করতে পেরেছে সে!

জন্মদিনের উপহার

—কুমারী হাসিরাণী নন্দ

স্কুল ছুটীর পর রঞ্জন বাড়ীতে ফিরে ধপ করে বইগুলো আছড়ে দিয়ে জামা না খুলেই টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

মা ছুটে আসেন—"কি রে শুলি কেন? অসুখ করেনি ত'? সময়টা যা' খারাপ—দেখিতো।" মায়ের স্নেহময় হাত রঞ্জুর কপালে পড়তেই রঞ্জু পরম নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে নিজেকে সঁপে দিয়ে শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—"না মা-মণি অসুখ করেনি।"

"করেনি তো? যাক বাবা বাঁচালি"—উদ্বিগ্ন মা কিছুটা শান্ত হন। ছেলের কপালে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মা ছেলের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করেন—"তবে নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে। কি হয়েছে বাবা খুলে বলতো।"

"বলছি মা-মণি" রঞ্জন একটু থেমে তারপর বলে—"জান মা-মণি কাল আমার বন্ধু তপনের জন্মদিন। তপনের সঙ্গে আমার কতখানি ভাব তা' তুমি জানো মা-মণি। আজ স্কুলে এসেছিল সে, আমাকে যাবার জন্যে খুব করে বলেছে, শেষে আমার হাত ধরে একথাও বলেছে, কাল যদি আমি ওর জন্মদিনে না যাই, তবে আর আমার সাথে বন্ধুত্ব রাখবে না। কিন্তু আমরা যে বড্ড গরীব মা-মণি, আর তপন ধনী ব্যারিষ্টারের ছেলে, তার জন্মদিনে উপহার দেবার মতও সামর্থ্য আমাদের নেই, তাই ভাবছি আমার যাওয়া চলবে কিনা। আবার না গেলেও তপনের মত বন্ধুকে হারাতে হয়। কি করব মা-মণি, বলে দাও তুমি।" রঞ্জন মায়ের হাতদুটি জড়িয়ে ধরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উত্তরের প্রত্যাশায়।

ব্যাপারটা শুনে মা হেসে রঞ্জুর চিবুক ধরে বলেন—"পাগল ছেলে এরই জন্য ভাবনা এত? তপনের মত বন্ধুকে তোমায় হারাতে হবে না বাবা। বন্ধুর জন্মদিনে তুমি যাবে বইকি। আর উপহার? সে জন্যে ভাবনা কি। হলই বা সে বড়লোক, হলিই বা তুই গরীব, তুই যদি তপনকে সত্যিই ভালবাসিস তাকে বন্ধু বলেই মানিস তা' হলে তোর অন্তরের সেই নির্ম্মল প্রীতি নির্ম্মল বন্ধুত্বই তপনের কাছে বড় উপহার। লোক দেখানো দামী দামী উপহারের চেয়েও তোর অন্তরের প্রীতি ভালবাসাই বড় উপহার। অন্তরের স্নেহ প্রীতি ভালবাসা দাম দিয়ে কেনার জিনিস নয়, লক্ষ টাকার বিনিময়েও এ জিনিসের তুলনা হয় না। এ জিনিস সবাই দিতে যেমন পারে না—নিতেও তেমন খুব কম লোকই পারে। কিন্তু তপন তেমন ছেলে নয়, সে পারবে তোর শ্রেষ্ঠ উপহার গ্রহণ করতে। স্নেহ, প্রীতি আর ক্ষমা এই তিনটিই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। মনে রাখিস, বন্ধুত্ব জিনিসটা তুচ্ছ নয়। তপনের সুখ দুঃখে তোর নিজেরই সুখ দুঃখ—এইটাই ভাবতে শিখলে মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না। আর ক্ষমাও তাই, তুচ্ছ অপরাধকে সামান্য ব্যাপারকে যদি বড় করে দেখ যদি সেই তুচ্ছ অপরাধটা ক্ষমা করতে না পার, তা' হলে বিচ্ছেদ সেখানে হবেই। সব জিনিসের মধ্যে থাকা চাই আন্তরিকতা, তা' হলে জীবনে দুঃখ অশান্তি আসবে না। আচ্ছা কালকের কথা কাল—এখন খাবি চলতো।" রঞ্জনের হাত ধরে মা খাওয়াতে নিয়ে যান।

রঞ্জন আর তপন। একই ক্লাসে দু'জন পড়ে, লেখাপড়ায় ওদের হারাতে পারে না কেউ। তাই ওদের বন্ধুত্বকে অন্য ছেলেরা সহজ ভাবে নিতে পারে না। আরও একটা কারণ এই, তপন হচ্ছে ব্যারিষ্টারের ছেলে রোজ গাড়ী না হলে আসে না। আর রঞ্জন দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান। ওর বাবা ছিলেন স্থানীয় স্কুল মাষ্টার। তিনি মারা যাবার পর রঞ্জনের মা অসীমা দেবী অনেক চেষ্টা

করে স্থানীয় একটি মেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে কষ্টে সংসার চালান। রঞ্জনই তাঁর একমাত্র সন্তান। তপন ধনীর সন্তান হলেও সে ঘৃণা বা অহঙ্কার কাকে বলে জানত না। দেখতেও যেমন ফুটফুটে তেমন মনটাও ছিল তার ফুলের মত নরম। এজন্যে তপন তার বাড়ীতে যেমন সবাইর আদরের, স্কুলেও প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে তেমনি স্নেহ পেয়েছে। তাই রঞ্জনকে বন্ধু করে নিতে তপনের দেরী হয়নি।

পরদিন মায়ের কথামত রঞ্জন রঙচঙে সুদৃশ্য মলাটের একটি গল্পের বই নিয়ে তপনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পাছে রঞ্জনের মন খুঁতখুঁত করে, এজন্যে অসীমা দেবী তাকে খুশী করার উদ্দেশে বইখানি কিনে দেন। রঞ্জন এর পূর্ব্বে কখনো তপনের বাড়ী যায়নি। তপন গাড়ী পাঠাবে বলেছিল, কিন্তু রঞ্জন তা' করতে দেয়নি। ব্যারিষ্টার মিঃ মিত্রের বাড়ী কে না চেনে? তবুও রঞ্জনের বুকটা দুরদুর করে। তপনদের বাড়ীর গেটে ঢুকতেই রঞ্জনের গা ঘেঁসে একটা টু-সিটার বেরিয়ে যায়। গেটের বাইরে এপাশে নানা রকমের নানা সাইজের গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের বুকটা কেঁপে ওঠে। সাহেবী পোশাক-পরা তপনের দাদা স্বপন মিত্র গম্ভীরমুখে আড়চোখে রঞ্জনের দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে চলে যান। রঞ্জনকে কেউ অভ্যর্থনা করে না। এদিক ওদিক চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে সে।

হঠাৎ তপন কোথা থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। রঞ্জন তাকিয়ে দেখে কি সুন্দর জামা পরেছে তপন, গলায় দুলছে একগাছা মালা, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। হঠাৎ তপনের পাশে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হয় তার। জামার নীচে লুকানো বইটি যেন খচখচ করে ওঠে। তপনের মুখ কিন্তু হাসিতে ঝলমল করে। রঞ্জনকে তেমনি জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। হাসিমুখে বলে, "সত্যি রঞ্জু, তুই যে আসবি আমি ভাবতেই পারিনি। ভেতরে না গিয়ে এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে আছিস্! ভারী অন্যায়! চল চল ভেতরে।"

"ছেলেটি কে রে তপন?"—রঞ্জন আড়ষ্ট হয়ে পেছন ফিরে দেখে তপনের মা তাকিয়ে আছেন তারই দিকে। সে-দৃষ্টিতে শুধু ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য। তপন তাড়াতাড়ি রঞ্জনের হাত ধরে টানতে টানতে বলে, "আমার বন্ধু। আয় রঞ্জু ভেতরে যাই।" তপন তাকে নিয়ে যায় নিমন্ত্রিত অতিথিদের বসবার ঘরে। প্রকাণ্ড হলঘর। সারি সারি চেয়ারে বসে আছেন অতিথিরা। তপন রঞ্জনকে একটি চেয়ারে বসিয়ে কি যেন বলতে যাবে এমন সময় স্বপন মিত্র ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে তপনকে ডেকে কিছু বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান। তপন রঞ্জনকে তাড়াতাড়ি বলে, "আমি আসছি রঞ্জু। তুই বোস।"

তপনের আর সব বন্ধুরা এক কোণে বসে হাসি-গল্পে মত্ত। রঞ্জনকে দেখেও দেখেনি তারা। রঞ্জন এই ব্যাপারে একটু বিস্মিতই হয়। একসময় তপনের বন্ধুরা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রঞ্জন চুপচাপ বসে থাকে। কারুর দৃষ্টি পড়ে না তার উপরে। রঞ্জন ভাবে কি করে তার তুচ্ছ এ উপহার তুলে দেবে ঐসব চোখ ঝলসানো জিনিসের পাশে। ঐ হলঘরেরই এককোণে ছোট্ট শ্বেতপাথরের একটি টেবিলে উপহারের জিনিস সাজানো। কেউ দিয়েছে পার্কার পেন, কেউ ছোট্ট রিষ্টওয়াচ—তবে বই-ই সবচেয়ে বেশী। কোন ধনী ব্যক্তি দিয়েছেন হীরে-বসানো আংটী। অবশ্য তপন যে এসব কখনও ব্যবহার করতে পারবে না তা' সে বেশ জানে। সবাই যে যার মান

মর্য্যাদা রাখতে সচেতন। রঞ্জন ভাবল তার ক্ষুদ্র উপহার সে সবার অলক্ষ্যেই রেখে দেবে, তা'হলে আর প্রকাশ্যে দেওয়ার লজ্জা থাকবে না এবং তার দীনতা কেউ টের পাবে না।

এই ভেবে চুপি চুপি উঠে গিয়ে টেবিলের উপরে বইখানি রাখতে যাবে হঠাৎ সেই সময় অপর এক দরজা দিয়ে কে যেন ঘরে ঢোকে। তাকিয়েই সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে যায় তার। সর্ব্বনাশ এ যে তপনের বৌদি রুমেলা। তপনের বাড়ীতে না এলেও ওদের বাড়ীর সবাইকে চেনে সে। পথে-ঘাটে হঠাৎ কোনদিন দেখা হয়ে গেলে সে সহজেই চিনতে পারে, যদিও গাড়ী ছাড়া পথে তাঁরা খুব কমই বেরোন। রুমেলাকে দেখেই বইটি পুনরায় লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় সে। রুমেলাও থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এগিয়ে এসে রঞ্জনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলে, "হুঁ, তুমি বুঝি তপনের বন্ধু?" রঞ্জন কোনমতে মাথা নেড়ে সায় দেয়। "ও আর তাই বুঝি বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে হাত সাফাই করছিলে। একঘর ভদ্রলোকের মধ্যে চুরি করতে সাহস হল তোমার, স্কুলে পড়ে এই বিদ্যাই শিখেছ বটে!" রুমেলার কঠোর স্বরে আকৃষ্ট হয়ে সবাই ছুটে আসে, 'কি হয়েছে', 'কি ব্যাপার', সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে রঞ্জনকেই দেখে। কিন্তু ব্যাপারটা কেউই বুঝতে পারে না। তপনের মা গোলমাল শুনে হাজির হলেন—"কি হয়েছে রুমেলা?" ব্যাপারটা জানতে চান তিনি।

রুমেলা বলে, "এই যে মা আমি ঘরে ঢুকে দেখি এই ছেলেটি টেবিলের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছিল, কিছু সরিয়েছে না কি কে জানে, জামার নীচে কি একটা লুকানো রয়েছে।" তপনের মা হুঙ্কার ছাড়েন। "হুঁ, ওকে প্রথম দেখে বুঝেছি ও হাবাতের ঘরের ছেলে, তখনই বুঝেছি একটা কাণ্ড বাধাবে। তপনকেও বলি দরকার কি বাপু ঐসব চোর-ছ্যাঁচোড়দের বলে, তা' নাও এখন।" রঞ্জন নির্ব্বাক, স্তব্ধ হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে—এ ব্যাপারের জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়। আজ এত অপমান লেখা ছিল কপালে, অপমানের চূড়ান্ত হল প্রথম দিনেই, কিন্তু তপন এ সময় কই।

মুখ তুলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে সে, "আপনারা অকারণ আমায় এরূপ জঘন্য অপবাদ দিচ্ছেন কেন, চুরি আমি করিনি,' সে স্বভাব আমার নয়, আর মিথ্যা কথা বলতে মা আমায় শেখাননি কোনদিন। আপনারা আমার প্রতি নিষ্ঠুরের মত অবুঝের মত অন্যায় ব্যবহার করছেন। আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু চোর-ছ্যাঁচোড় নই। গরীব হলেই চোর হয় না। আপনারা ধনী, আমি গরীব। আজ যে অন্যায় করলেন আমার প্রতি এক্ষেত্রে এ অন্যায়ের প্রতিকার করার সাধ্য হয়তো আমার নেই, সেইজন্যই আমি এর প্রতিবাদ করছি। অন্যায় আমি সহ্য করি না।"

জামার নীচ থেকে বইটা বার করে রুমেলার হাতে দিয়ে বলে, "গরীব বলে এই তুচ্ছ উপহার লজ্জায় সবার অলক্ষ্যে অগোচরেই দিতে চেয়েছিলাম। আমার এই সরলতাকে আপনারা ইচ্ছে করে জটিল করে আঘাত করলেন আমাকেই। যাক, ব্যাপারটা আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে। তপনকে ওটা দিয়ে দেবেন।" রুমেলার দিকে তাকিয়ে বলে, "চুরি করাকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু আমাকেই চোর অপবাদ শুনতে হল। হয়তো আপনারা বলেই পারলেন। ক্ষমা করবেন আমায়"—কথাগুলি শেষ করে অভুক্ত রঞ্জন দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় চোখ মুছতে মুছতে। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধ নির্ব্বাক প্রাণীদের মধ্যে এতক্ষণে সাড়া পাওয়া যায়—'ইস কি বড় বড় কথা', 'এইটুকু ছেলের কি তেজ', 'বুকের পাটা দেখেছিস্', 'হুঃ ভারী একটা বই' ইত্যাদি নানা ধরণের কটু মন্তব্য। রুমেলা লজ্জিত অপ্রস্তুত মুখে বইটির পাতা

উল্‌টেই দেখতে পায় এক কোণে ছোট্ট ছোট্ট ক'রে লেখা, "প্রিয় তপন, তোর দরিদ্র বন্ধুর এই সামান্য উপহারের সঙ্গে উজাড় করে দিলাম আমার স্নেহ, প্রীতি আর ভালবাসা। এ ছাড়' দেবার আর আমার কিছু নেই, তুই এটুকু গ্রহণ করলে আমার দেওয়া সার্থক হবে। সারাজীবন মনে থাকবে তোর কথা,—ইতি তোর বন্ধু 'রঞ্জু'।" এক পাশে নাম লেখা শ্রীরঞ্জনকুমার মৈত্র।

রঞ্জন পথে এসে ভাবে ধনীর দুয়ারে গরীবদের কি এমনি করেই অপমানিত হতে হয়। তপন বাড়ীতে নিশ্চয়ই নেই, থাকলে এমন ব্যাপার কখনোই হতে দিত না। তবুও সে ক্ষমা করেছে। মায়ের কথা মনে পড়ে। স্নেহ প্রীতি ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। মনে মনে সে তার বন্ধুকে প্রীতি অভিনন্দন জানায়, প্রার্থনা করে তার সুখের জীবন সুখময় ভবিষ্যৎ। তার জন্মদিনে এ ছাড়া আর কি দিতে পারে সে।

হাওড়া জেলার সুলতানপুর গ্রাম নিবাসী **শ্রীবিমলচন্দ্র বাগানী** তাঁহার স্বর্গীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"প্রশান্ত সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে এক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ঃ

যে কোন করুণ কাহিনী

১। শুকতারার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান -করতে পারেন। ২। কার্ত্তিক-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত রচনা গৃহীত হবে। ৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা "শুকতারা" পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ৪। শুকতারা কর্ত্তৃপক্ষের বিচারই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। রচনার গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৩৲ টাকা দামের বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ২৲ টাকা দামের বই।

রেডিও সেট তৈরী

ট্রানজিস্‌টার দিয়ে রেডিও সেট—কেমন করে এ রকম রেডিও সেট করা যায়, অনেকেই সে সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। তাই শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শুকতারা" অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে ছবির সাহায্যে বিশদভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **শুঃ সঃ**

রবার্ট ফুলটনের জীবন-চিত্র

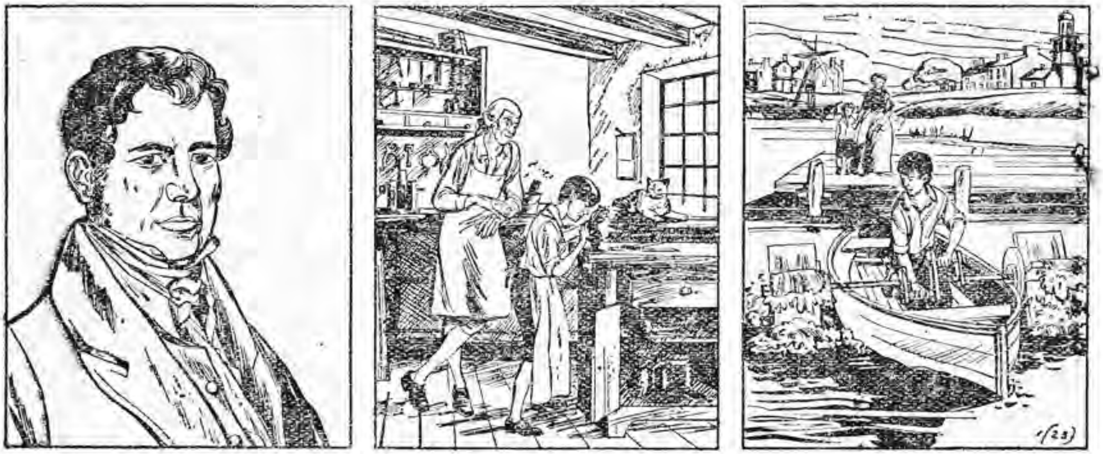

১। আবিষ্কারক—বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি সাগর ও মহাসাগরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল—একটির সহিত আর একটির বিশেষ কোন সংযোগ ছিল না। বর্ত্তমানে কিন্তু বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে এই সকল বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। বহু ব্যক্তির সাহায্য ও চেষ্টার ফলে এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হয়েছে। সেই সব লোকের মধ্যে রবার্ট ফুলটনের নাম বিখ্যাত।

২। বাল্যকাল—১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফুলটন আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে এক দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সকলে তাঁকে বোকা বলেই জানত। তাই লেখাপড়া না শিখিয়ে অলঙ্কার তৈরীর কাজ শেখবার জন্তে ছেলেবেলায় তাঁকে এক স্বর্ণকারের কাছে পাঠান হয়।

৩। সুরু—ছেলেবেলা থেকে নতুন কিছু করার দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। ছবি আঁকা ও মাছ ধরাও তাঁর ভাল লাগত। গতর খাটিয়ে নৌকা চালান তিনি অপছন্দ করতেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের দ্বারা খুব সহজে নৌকা চালান যেত। উপযুক্ত বিপদমুক্ত যানবাহনের অভাবে পৃথিবীর বিষয়ে লোকের জ্ঞান ছিল তখন সীমাবদ্ধ। নানা কুসংস্কারে মন ছিল আচ্ছন্ন। এই আবিষ্কারের পর থেকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধ সুরু হোল।

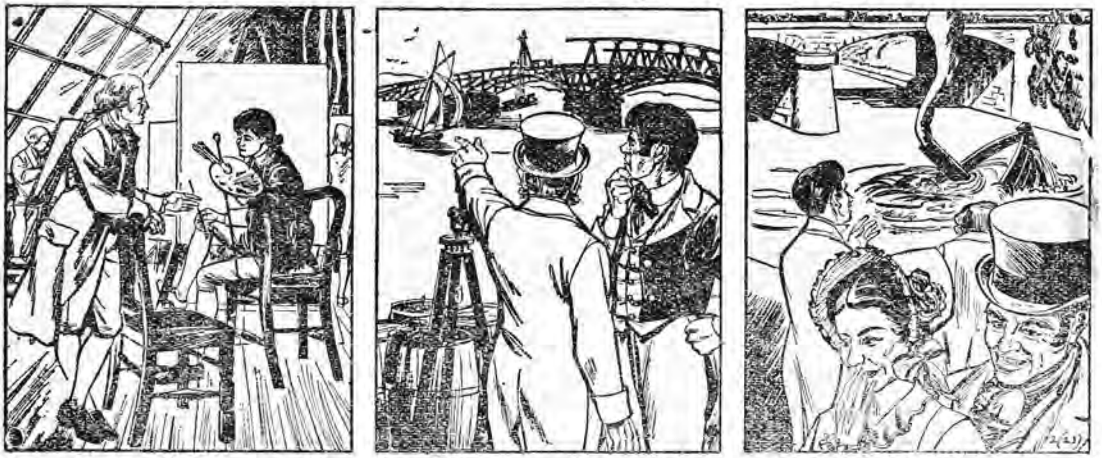

১। চিত্রকর—১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত চিত্রকর বেনজামিন ওয়েষ্টের কাছে ফুলটন চিত্র-বিদ্যা শিখতে যান। যন্ত্র আবিষ্কারে ফুলটনের প্রতিভা দেখে বেনজামিন তাঁকে বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেন।

২। প্রতিভা—ফুলটনের মন নূতন আবিষ্কারের চিন্তায় সদাই মগ্ন থাকত। তাঁর নীতি ছিল—যদি কোন বিষয়ে অভাব দেখ, কি করে সে অভাব দূর করা যায় সেই চেষ্টা কর। তিনি অনেক রকম কৌশল আবিষ্কার করেন—যেমন মার্বেল কেটে পালিস করা, দড়ী পাকান ও গাছ-বিশেষের আঁশ পেঁজা। একটা লোহার সেতুর নক্সাও তিনি তৈরী করেন। কিন্তু খালের লক-গেট নির্ম্মাণে তিনিই সর্ব্বপ্রথম।

৩। অকৃতকার্য্য—নিজের টাকায় বাষ্পীয় পোত তৈরী করে ফুলটন সেটি প্যারিসের সিন নদীতে ভাসান। দেখতে দেখতে সেটি নদীতে তলিয়ে যায়। অকৃতকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও ফুলটন নিরাশ না হয়ে আরো একটি পোত তৈরী করে জলে ছাড়েন। এবার তিনি সফল হন বটে, কিন্তু বাষ্পীয় পোতের গতিবেগ হয় খুবই কম।

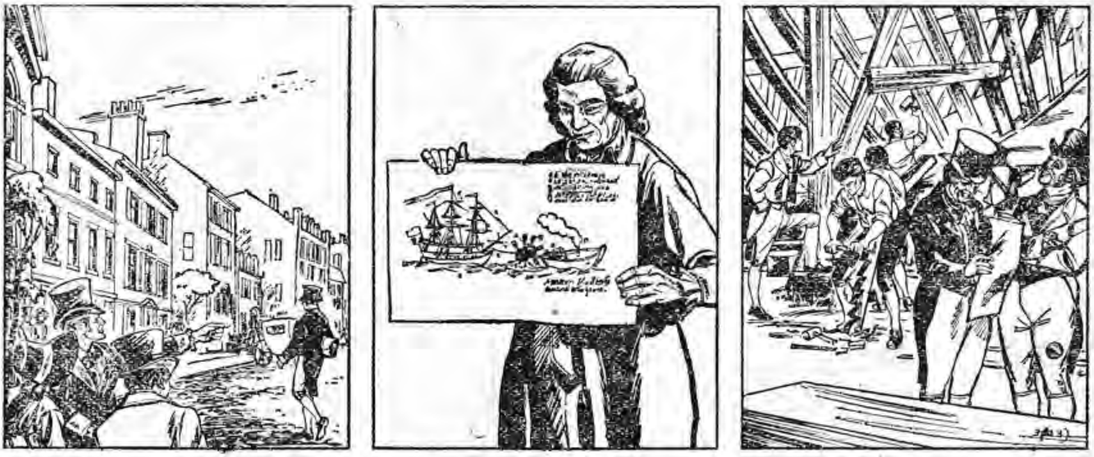

১। প্রত্যাবর্ত্তন—১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন। বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে সাগরে যাতে চলাচল করা যায়, সেই চেষ্টা করতে তাঁর স্বদেশে আসা। কিন্তু সব কাজের সুরুতে যেমন একদল বাধা দিতে এগিয়ে আসে, ফুলটনের ভাগ্যেও এর বিপরীত কিছু ঘটল না। তাঁকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হল।

২। পথ-প্রদর্শক—বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারে যাঁদের নাম শোনা যায় তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন ইংল্যাণ্ডের জোনাথন হাল। আমেরিকার জন ফিচ্ হলেন দ্বিতীয় এবং স্কটল্যাণ্ডবাসী উইলিয়াম সিমিংটন হলেন তৃতীয়। কিন্তু তাঁদের আবিষ্কৃত পোত কাজের উপযুক্ত নয় বলে বাতিল হয়।

৩। সমালোচনা—ফুলটনের আবিষ্কার তখনকার দিনের সমালোচকেরা পূর্ব্বতন আবিষ্কারকদের নকল বলে সমালোচনা করলেও আসলে কথাটি ঠিক নয়। তাঁর পূর্ব্বতন আবিষ্কারকদের ভুল থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেন মাত্র। যা' হক, তিনি যে এ কাজ পারবেন তাতে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে। যখন তিনি প্রথম বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাণের চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। সংবাদ-পত্রেও তাঁকে ঠাট্টা করা হয়। আত্ম-নির্ভরশীল ফুলটন কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করে তাঁর কাজে অগ্রসর হন।

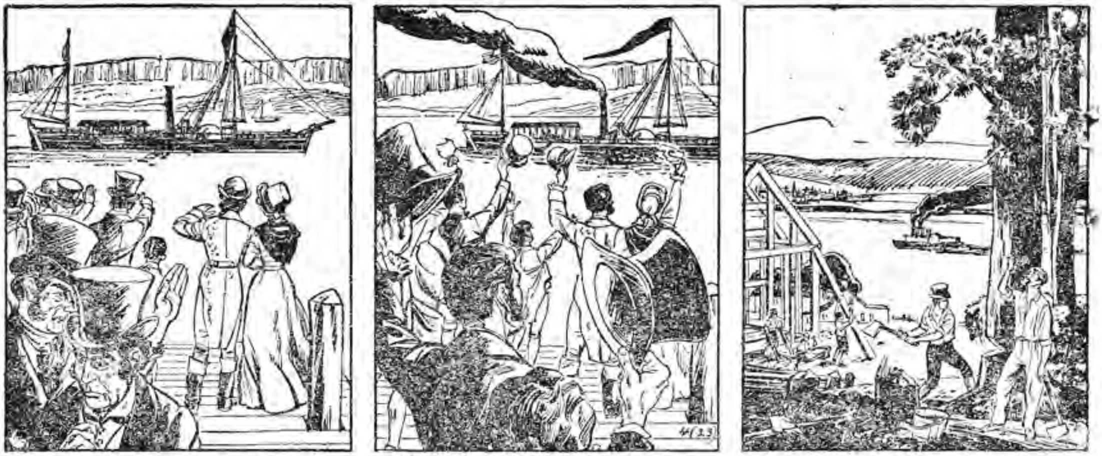

১। ফুলটনের বোকামি—১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে ফুলটনের এক বাষ্পীয় পোত তৈরী হয়। লোকে বিদ্রূপ করে তার নাম দেয় 'ফুলটনের বোকামি'। হাডসন নদীতে ১৭ই আগষ্ট জাহাজটি চালান হয়। সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হবে বলে লোকে ধারণা করে।

২। সফলতা—দর্শকদের নিরাশ করে জাহাজটি কিন্তু চলতে সুরু করে! আনন্দে দর্শকরা অভিনন্দন দিতে থাকে। নিউইয়র্ক থেকে এলবাণী ও এলবাণী থেকে নিউইয়র্ক যাওয়া আসায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ এই জলপথ—বাষ্পীয় পোতটি ৬২ ঘণ্টায় সম্পাদন করে।

৩। সুফল—এই কার্য্যের ফলে বহুলোক বুঝতে পারে ভবিষ্যতে বাষ্পীয় পোতের আদর বাড়বে। ফুলটনের সহযোগিতায় তারা কাজ সুরু করে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে 'নিউ অরলীন্স' নামে বাষ্পীয় পোত নির্ম্মিত হয়। এই জাহাজটি চলাচলের ফলে দুর্গম পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন সহজ ও সরল হয়ে উঠে।

১। উন্নতি—এইবার বাষ্পীয় পোতের উন্নতি সুরু হয়। মিসিসিপি ও ওহিও নদী বাষ্পীয় পোতে পূর্ণ হতে থাকে। পার্শ্বচক্রবিশিষ্ট বৃহৎ বাষ্পীয় পোতগুলিকে আমেরিকার নদীতে মাল ও যাত্রী বহন করে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যায়।

২। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা—১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পীয় পোত প্রথম ইংলিস চ্যানেল পার হয়। বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করা সহজ হবার পর, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩। জগতের সেবা—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ফুলটন দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় ১৫০ বছর কেটে গেছে। এখন দৈত্যাকৃতি জাহাজ আটলান্টিক মাত্র চারদিনে পারাপার করে। এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছে ফুলটনের আবিষ্কারের ফলে।

সোনার ভারত

—শ্রীমধুসূদন মজুমদার

১৯০৫

১৯০৫ সাল…১৬ই অক্টোবর……

বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে গঙ্গার দিকে…পুরোভাগে ঋষিকল্প এক সৌম্য মূর্ত্তি…আজন্ম বিলাসে লালিত…কিন্তু কোন বিলাসের আকর্ষণই তাঁকে আজ ঘরে আটকে রাখতে পারেনি…দেশের ডাকে তিনি নেমে এসেছেন রাজপথের উপর……

কবি রবীন্দ্রনাথ…

গঙ্গা-স্নানের পর কবি স্বহস্তে রাখি বেঁধে দেন প্রত্যেক শোভাযাত্রীর হাতে…বাঙ্গালীর হাতে…অত্যাচারী বিদেশী শাসক ঘোষণা করেছে আজ… বাংলা দেশ আর বাংলা দেশ থাকবে না…বিভক্ত হবে পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাংলায়…তাই আজ এই রাখি-বন্ধন…বিচ্ছেদের দিনে মিলনের বন্ধন…

বাঙালীর ঘরে ঘরে আজ অরন্ধন…পথচারীর পদদ্বয় আজ নগ্ন… ব্যবসা-বাণিজ্য হাট-বাজার…গাড়ী চলাচল…সব আজ বন্ধ……

আজ বাঙালীর বিষাদের দিন…কিন্তু মনে তার দৃঢ় সংকল্প ঃ অখণ্ড বাংলাকে কেউ করতে পারবে না খণ্ডিত !

মুক্ত প্রান্তরে শোনা যায় সুরেন্দ্রনাথের সিংহ-গর্জ্জন ঃ কে ঐ লর্ড কার্জ্জন ? আমাদের বাংলাকে খণ্ডিত করার কি অধিকার আছে তার ? বাঙালীর রাজনৈতিক অগ্রগতি রুদ্ধ করতে ইংরেজ শাসকের এই চাতুরী কোনক্রমেই স্বীকার ক'রে নেবে না বাঙালী জাতি !

বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আন্দোলিত হয়ে উঠে সাগর-তরঙ্গের মত। তীব্র বিচ্ছেদের জ্বালায় বাংলার প্রাণ হয়ে উঠে চঞ্চল…বিক্ষুব্ধ……

১নং চিত্র। কবি স্বহস্তে রাখি বেঁধে দেন।
২নং চিত্র। বাংলাকে খণ্ডিত করার কি অধিকার আছে তার?
৩নং চিত্র। এগিয়ে আসেন তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন।

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মহামতি গোখলের বাণী শোনা যায়ঃ বাংলা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে, সে আদর্শের অনুসরণ করবে সমস্ত ভারত।

দলে দলে কিশোর ও যুবক যোগ দেয় বিপ্লববাদীর দলে···বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় তরুণ বাংলা······

অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে নিহত হন মিসেস কেনেডি। ঐ আসে পুলিস···ধরা পড়বার আগেই কিশোর প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতেই নিজের দেহকে করেন ভূ-লুণ্ঠিত! আর কিশোর ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে করেন আরোহণ!

জেলের মধ্যেই কানাইলাল রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা ক'রে নির্ভীকচিত্তে ফাঁসির রজ্জু গলায় তুলে নেন।

মাণিকতলায় পুলিস একটা বোমা তৈরির কারখানা করে আবিষ্কার। বন্দী হন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বারীন, উপেন আর উল্লাস······

অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন······

ক্ষুরধার তাঁর যুক্তি-জালে ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের চক্রান্ত যায় ফেঁসে······ অরবিন্দ পান মুক্তি······

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলার দিগ্-দিগন্ত··· বিদেশী শাসকের বুকে গিয়ে তা' বাজে শেলের মত—ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চালায় নির্ম্মম অত্যাচার।

মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে শত শত বাঙালী তরুণ যায় সুদূর দ্বীপান্তরে··· হাসতে হাসতে উঠে ফাঁসির মঞ্চে······

স্তব্ধ হয় না বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন···

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নড়ে টনক···বুঝতে পারে সে, বাংলার আগুন যে কোন মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে সারা ভারতে······

১৯১১ সাল। বঙ্গভঙ্গ রদ—ঘোষণা করতে বাধ্য হল বিদেশী শাসক। বাঙালী তথা ভারতবাসীর ললাটে পড়ল জয়টিকা।

[ক্রমশঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। প্রজাপতি

২। আসাম

৩। শের সা ও বাঘা যতীন (বাঘ মেরেছিলেন)

৪।

৭নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৬৪ সন

প্রিয় শুকতারার ভাই-বোনেরা,

এবার পূজায় আর কোথাও না গিয়ে কলিকাতাতেই থাকবো। তাই বলে ঘরে বসে থাকতেও আমরা রাজী নই। একদিন যাদুঘর, একদিন চিড়িয়াখানা ও একদিন গান্ধীঘাট দেখে এসে, দুটো বাংলা ও আর একটা ইংরেজী বায়স্কোপ দেখবো। তারপর চুপচাপ ঘরে বসে পূজায় প্রকাশিত দেব-সাহিত্য কুটীর-এর বইগুলো মজা করে পড়বো। দেখতে দেখতে পূজার ছুটীও শেষ হয়ে যাবে। তারপরেই তো শুরু হবে পরীক্ষা!

তাই দাদু বলেন, তখন যত খুশি নাচো, গাও, বেড়াও আপত্তি নেই। তবুও কিন্তু আমাদের ছুটীটা কাটবে ভালো।

ইতি—
তোমাদের
অলোক ও করবী

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

নীরেন্দ্র, শৈলেন্দ্র, অবনীন্দ্র, বাসুদেব, অম্বুজ, পঙ্কজ, গীতা, সন্ধ্যা, রেণুকা প্রভৃতি—জবড়রা পাড়া, পুরুলিয়া; হরকালী, সুভাষ ও শিপ্রা ঘোষ—আগ্রা; শ্যামল, গীতি, বীথি, স্বপন ও কাজল রায়—কাটিহার, পূর্ণিয়া: বিহারী-লাল ধোবা—(১২৩৫৩) ডুবড়া; দিলীপকুমার মুখার্জ্জী—গুমলা, রাঁচী; বাবলু, সুধাংশু, নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, কমলারাণী, সবিতারাণী, রঘু, বঁচু, দিপু, দাদু, মণ্টু ও রবীন—(১৭৩২৭) ধারন্দা; রিণু, বেণু, বাবলী, বাচ্চু, টুটুল ও রেণু রায়চৌধুরী—(১২২০২) কারোলবাগ, নিউদিল্লী; চাঁপাশোল আংশিক বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ—বোধনা, মেদিনীপুর; নির্ম্মল ও পিনাকী—আর, ডি, টাটা হাইস্কুল, জামসেদপুর; কুমারী নারায়ণী চক্রবর্ত্তী—নর্থ গৌহাটি (আসাম) গার্লস স্কুল, ৮ম শ্রেণী; কুমারী সুচিত্রা কুণ্ডু—ডুবচাচিয়া, বগুড়া; শ্রীকল্যাণকুমার বসু—(১৭৩১২) সোদপুর কারখানা, বর্দ্ধমান; প্রতিমা চক্রবর্ত্তী—সাহাপুর, হুগলী; রেখা ও শ্রীলেখা—আনন্দ ওয়ার্দ্ধাভবন, জামসেদপুর; রেখা, রেবা, বীণা, মীনা, স্বপ্না, রত্না, গীতা, কুনু, নিমু, রাখাল, সত্যেন, নিতাই, সুনীল, শিপ্রা ও প্রদীপ—নামদা টিন প্লেট, জামসেদপুর; অনুতোষ, রথীন, সমর ও মিহির—(১৫৩৫৪) শিয়াখালা, হুগলী; শ্যামা, অনিল ও সমর রায়—কুমারডুবি; মানসরঞ্জন সেনিক—অনন্তপুর, হাওড়া; দীপ্তি

মণ্ডল ও মায়া কুঁওর—নুতনডিহি, ঝাড়গ্রাম ; বিশু, দোদন, মঞ্জু, রত্না, মন্দিরা, বীথিকা, অঞ্জলী, বিলু, বাবু ও সলিল—কদমা, জামসেদপুর ; শীলা, কৃষ্ণা, নিভা, বাব্‌লি, মমতা, শেফালী, অপর্ণা, বীথি ও জয়শ্রী—বোকারো, হাজারিবাগ ; শ্রীসুবীরকুমার রাহা—রেলওয়ে হাইস্কুল, গৌহাটী ; বাপ্পিমণি, মা, মামা, বৌদি, নদা, ফুলদা, আমি, লাটু ও বিভূতি—সিন্দ্রী ; মেরী—দিল্লী-৫ ; দ্বিজেন, মাণিক, অনিল, সোমনাথ, মনুয়া, সনৎ, হিরা, ভক্তি, ভব, সুবল ও দিলীপ—চিরকুণ্ডা, ধানবাদ ; তপতী, কৃষ্ণা, কিরিটীমাধব ভট্টাচার্য্য, ছোটমামী, সেজমামী ও মা—নিউদিল্লী-৫ ; নিখিল, বারীদ, অজিত, কেশব, মাধব, খোকন, বাবু, মহাবীর, গোবিন্দ, মোদী, পাঁচুদা, শোভান, শ্যামসুন্দর, শশধর, গীতা, শোভা, মান্ত, পান্ত, দুর্গা, শান্তি প্রভৃতি—গোলঘর, শ্রীরামপুর ; হেনা, মণি, ফণি ও সুদীপা কর—(১৭২২৩) শিলিগুড়ি ; কেকা, অশোক, রিতা, নিতা, দাদা, সমীর ও নন্দ—কুমারডুবি ধানবাদ ; মানু, বাচ্চু, ঝুনু, বিশু, কুলু, চিতু, মিতু, রুণু, মা, তাতা প্রভৃতি—জে. রোড, জামসেদপুর ; রেণুকা ও সুমিত্রা ব্যানার্জ্জী—ডি. এম. মদন গার্লস্‌ স্কুল, জামসেদপুর ; শিবাণী, কমলা, সুধা, ইন্দু, মৃদু, বাচ্চু, দাদা ও গায়ত্রীদি—কলিকাতা-৬ ; ধীরাজ, ভৌমিক—গোলগ্রাম, মেদিনীপুর ; সুব্রত, সুনন্দা, সুভাষ, শম্ভু, অমিতাভ, প্রবীর, রাজা, মনোজ, কল্যাণী ও রামদাস—(১৩৩২০) কলিকাতা-২০ ; সারদাপ্রসাদ কিস্কু—দাঁড়িকাডোবা, পুরুলিয়া ; বিদ্যুৎ, তিনকড়ি, অরুণ ও পূর্ণ—রঘুনাথপুর ; বিধানচন্দ্র রায়—রেলওয়ে স্কুল, গৌহাটী ; ইন্দুভূষণ, প্রদীপ, প্রীতিরাণী, প্রসিত, যতীন্দ্র, গোতী ও লুসি প্রভৃতি—কারোলবাগ, দিল্লী-৫ ; আলো, দাদু, মা, বাবা, কাকা প্রভৃতি—সীতাবন্দী, নাগপুর ; মিলি, বাণী, বন্দনা, রীণা ও কণা সেনগুপ্তা—খাগোল, পাটনা ; তিমিরবরণ, সুপ্রিয়রঞ্জন, হাসিদাস, চিত্তবাবু, দেবব্রত, প্রবীর, ভুপেন, সুনীল দেঁড়, নেরু ও আমরা—রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-১২ ; জ্যোতি, জয়ন্তী, শুভেন্দু, মণি, জয়শ্রী ও উৎপল—(১০৮৩৭) মজঃফরপুর ; বেণু ও কুহু ভট্টাচার্য্য—(১৫৯৬৮) সম্বলপুর ; জহর সেন—(১০৪৪৩) দক্ষিণ কাছাড় ; কল্যাণকুমার ও ফণী—(১১৮৫৪) নগেন্দ্রনগর, নদীয়া ; নন্দগোপাল, অসীতবরণ, বাসুদেব, প্রদীপ, নারায়ণ, উমা, বাবু প্রভৃতি—(১২১৪৫) পঞ্চাননতলা, হাওড়া ; মলয় ও কুমকুম ; নমিতাদি, আশুতোষ, বেণু, তাপসকুমার, লক্ষ্মী ও জনা—কেশরপুর, কটক ; বামনদাস মুখোপাধ্যায়—শিবালা, বারানসী ; দীপ্তি, অসীত, বীথি, পন্টু, ছবি, প্রদীপ ও মিলি—দুমকা, এস, পি, ; বেনু ও লীনা—জে. কে. নগর ; পূর্ণিমা, শুক্লা, শঙ্কর, বোঁচা, বাবা, মা ইত্যাদি ; মা, মণ্টু, নণ্টু, সমীর, সুধীর, রাণী, বাণী, বীথি, প্রীতি ও নোটন—সিউড়ী বাবুইপাড়া, বীরভূম ; আরতী, মায়ারাণী, নাগু ও অসিতবরণ—(১২০৩৮) রাগমুণ্ডী, পুরুলিয়া ; শিবাণী, তপতী, সুস্মৃতি ও চম্পা—কাটিহার ; সুমিতা, সুব্রত, সুমন্ত ও সুদীপ্ত সিংহ—বম্বে-৫ ; অমৃত, নির্ম্মল, নিখিল, দীপু, বিশুদা ও নারুদা—সোদপুর, বর্দ্ধমান ; নূপুর—নিউ সিতারাম ডেরা, জামসেদপুর ; পিটু, দীপু, মনু, ছুটু, সন্টু, মণ্টু ও বুটু বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৪৯৪২) লক্ষ্ণৌ ; কুমারী রত্নাবলী মৈত্র—(১৫৭৫৭) ঘোড়ামারা, রাজসাহী ; রুবী ও গার্গী দাশগুপ্তা—বারাসত, ২৪ পরগণা।

নূতন ধাঁধা

১। একই নামের দুই প্রসিদ্ধ রাজা, একজন পৌরাণিক যুগের, অন্য জন ঐতিহাসিক যুগের। একজনের খ্যাতি ত্যাগের জন্য, অন্য জনের খ্যাতি বীরত্বের জন্য। কে তাঁরা ?

—সবিতা সেনগুপ্তা, মধ্যমগ্রাম

২। একটা চতুষ্পদ, একটা সাপ, একটা মাছ। সব কয়টি নামের প্রথম অক্ষরটাই আলাদা, আর সব অভিন্ন। কী তারা ?

—অমল, কমল ও রুবী, নবদ্বীপ

৩। এমন একটি তীর্থস্থানের নাম কর যার প্রথম অক্ষরটি লুকিয়ে আছে, ও দ্বিতীয় অংশটি দিয়ে হয় আর একটি তীর্থস্থানের নাম।

—বুটু বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৪৯৫২) লক্ষ্ণৌ

"হাসির চিঠি"

কাতা-২৬

প্রিয় র রা

র ছুT কাটলো কেমন, ?
কি মজা ভাE পেলি জানাস পেA।
AদিK যে তে , আমি ঘুম!
হঠাৎ a গিA a লো— নেE কো র ঘুম।
ফেলে T আমার শুধু e K ,
মিচ্‌কি হাসে, ভেংচি কাটে, যতE বকি তাK।
নেE কো তার য় খেয়াল, মনT উড়ু উড়ু,
হ'তে সন্ধ্যে — হয়না শুরু।
র সাথে দেখা হ'লে, সাJ ভালো মেa।
আমিE K দুষ্টু ছেলে;" aই তাহার চেa!
স্নো-পাউডার মাখার ক'রে, খ্যাবড়া A মাK,
মিচ্‌কি হাসে, ভেংচি কাটে, যতE বকি তাK।
ব্যস্ত K — নেe কো য় মন
হঠাৎ দোরের গোড়ায়, জানাE সর্বক্ষণ।
কি হ'বে ভাE, Aমন র বলতে পারো কারা?
জোরে কথা বললে পরে, কেঁদেই হ'বে সারা!
R, দৌড়ে গিa নানান ক'রে লাগিয়ে দেবে K
মিচ্‌কি হাসে, ভেংচি কাটে, যতE বকি তাK।

Eতি, ও

শ্রীস্বপনবুড়ো

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

বন্দে মাতরম্।

পূজো শেষ হ'ল; কর্ম্মের রথ তোমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে আবার; তাতে আরোহণ করে যুদ্ধজয় কর—এই আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।

তোমরা অনেকে হয়তো ভাবছো, ছুটিটা না ফুরিয়ে গেলেই ছিল ভাল। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো? কাজ না করে চুপ করে বসে থেকে কেউ কখনো মানুষ হতে পারে না। গীতায় আছে—

'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন,
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, পৃথিবীতে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নেই, ত্রিভুবনে পাই নি বা পাবার আকাঙ্ক্ষা করতে পারি—এমন কিছু নেই, তবু আমি নিয়ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েই আছি।

পরমজ্ঞানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি এমন কথা বলেন, তবে আমাদের মত তুচ্ছ মানুষের কি চুপ করে বসে থাকা শোভা পায়? তাই আমাকে ফিরে আসতে হলো তোমাদের কাছে। কাজ আমাকে করতেই হবে। শুধু আমাকে নয়, ছোট বড় সকলকেই।

এবার পূজায় প্রতিমা দেখতে বেরিয়েছিলে তো? কি দেখেছো পূজামণ্ডপে? নানা রঙের আলোর বাহার আর কানের পর্দ্দা ফাটানো মাইকের চীৎকার? একটু সুস্থির ভাবে সুস্থ মনে মাকে দেখতে পেয়েছিলে কি? তোমরা নিশ্চয় জবাব দেবে—না।

আমি জানি—মাও সুস্থির ভাবে তোমাদের সামনে দেখা দিতে পারেন নি। অনেক পূজার মণ্ডপেই আমি দেখেছি মা দশভুজাকে অশাস্ত্রীয় উপায়ে নিজের খুশীমত সাজানো হয়েছে। দশপ্রহরণের মধ্যে দেওয়া হয়েছে নীয়নের বৈদ্যুতিক আলো-প্রবাহ, মায়ের অঙ্গেও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। যথেচ্ছাচারিতা করা হয়েছে মাতৃ-প্রতিমা নিয়ে।

আরো কি দেখেছি জানো? উৎসবের নামে মায়ের সামনে করা হয়েছে পৈশাচিক নৃত্যের আয়োজন। হাতে মশাল, মুখে স্পিরিট বা কেরোসিন তেল নিয়ে প্রলয় নৃত্য করা হচ্ছে মূর্ত্তির কাছে। ঘন ঘন ফুৎকারে সেই আগুনের হলকা ছুটে যাচ্ছে দূরে—কখনো দর্শকের গায়ে কখনো বা মূর্ত্তির উপর। সেই আলোতে আমার চোখে কি ভেসে উঠল জান? একটা বুকভাঙ্গা দৈন্যের ছবি। তরুণ বাংলার সে শৌর্য্য-বীর্য্য কোথায়? কোথায় তার সেই বাহুর সবলতা? দশ-প্রহরণ-ধারিণী মহিষ-মর্দ্দিনী মায়ের পূজাকে যে দিয়েছিল সকলের উচ্চে স্থান এ কি সেই বাঙ্গালী? ক্লীবতা বীভৎসতার আস্ফালনকে যে মনে করছে বীরত্বের পরিচয়?

শিউরে উঠলাম আমি! বলতো, এই কি আমাদের মাতৃপূজা? এরই নাম ভক্তি, এরই নাম আনন্দ? বীর সন্তানের এই কি স্বরূপ?

আনন্দময়ীর আগমন কি ব্যর্থ হয়নি পূজামণ্ডপে?

তারপর সেখান থেকে চোখ ফিরিয়েছি একটু পেছন দিকে। দেখেছি পথের ওপাশে বসে আছে ছিন্ন মলিন বসন-পরিহিত নারী পুরুষ ও শিশুর দল। ওরা কারা? দেখে মনে হয় তোমার আমারই মতন তারাও মানুষ। বন্যার প্লাবনে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় আজ তারা এসে দাঁড়িয়েছে নগরীর রাজপথে। ভিক্ষা করতে তাদের সঙ্কোচে বাধে—অথচ তারা একান্ত নিরুপায়।

তাদের দিকে তাকিয়ে আবার আমি ফিরে চেয়েছি আর এক পূজামণ্ডপের মাতৃমূর্ত্তির দিকে। দেখেছি মায়ের অনিন্দ্যসুন্দর উজ্জ্বল মুখখানিও যেন ঐ লোকগুলোর মুখের মত কালো হয়ে গেছে; মণ্ডপের চোখ-ধাঁধানো আলোগুলিও যেন হয়ে গেছে ম্লান।

আমি নীরবে চলে এসেছি অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে—বিষাদক্ষুব্ধ অন্তরে। এই কি মাতৃপূজার পরিবেশ! আমরা কি দেখলাম মাকে আর মা-ই বা আমাদের কি দেখলেন!

তাপদগ্ধ হৃদয়ের কোণ থেকে এ প্রশ্নই আজ মনে জাগছে—আমরা কি এখনো মাতৃপূজার যোগ্য হইনি? এখনো কি আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে পারি না—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়—

অর্থাৎ অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও? এখনো কি আমরা আছি দূরে···অনেক দূরে? তাই কি আমাদের এত দুঃখ এত লাঞ্ছনা?

দেশমাতৃকার নবীন পূজারীর দল, তোমরা যোগ্য হও। দেশকে করে তোল মাতৃবন্দনার যোগ্য পীঠস্থান। তবেই বর্ষে বর্ষে মায়ের আগমন সার্থক হবে। মায়ের করুণা অজস্রধারায় বর্ষিত হবে সন্তানের উপর। দুঃখ অভাব ঘুচে গিয়ে দেশ ভরে উঠবে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে। জয় হিন্দ্।

—দাদুমণি।

মানুষের হাতে গড়া চাঁদ

এত দিন তোমরা জানতে পৃথিবীর চাঁদ মাত্র একটি। এবারে কিন্তু পৃথিবীর আর একটি চাঁদের সৃষ্টি হল। প্রথম চাঁদটি সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর; কিন্তু দ্বিতীয় চাঁদটি সৃষ্টি করেছেন আমাদেরই এই পৃথিবীর মানুষ—রুস বৈজ্ঞানিকেরা। দ্বিতীয় চাঁদ তৈরি করার চেষ্টা অনেক দিন থেকেই করে এসেছে মানুষ—কিন্তু এতদিন পরে সে হয়েছে সাফল্যমণ্ডিত।

গত ৪ঠা অক্টোবর ক্ষেপণাস্ত্রের (রকেটের) সাহায্যে মহাকাশে এই কৃত্রিম চাঁদটি প্রেরিত হয়েছে। এই চাঁদের ব্যাস তেইশ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় দুই মণ দশ সের; বেগ ঘণ্টায় সতেরো হাজার মাইল; সমগ্র পৃথিবী একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে পঁচানব্বই মিনিট অর্থাৎ দেড় ঘণ্টার সামান্য বেশী সময়; পৃথিবী থেকে পাঁচশত ষাট মাইল উঁচুতে এই চাঁদ ঘুরছে। কৃত্রিম চাঁদ আকাশে ছাড়ার পর ইহা আজও ঠিকমত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে—এবং বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, এই চাঁদ বহুদিন পর্য্যন্ত এভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে।

তোমরা জেনে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হবে, এই কৃত্রিম চাঁদে যে বেতার প্রেরক যন্ত্র বসানো হয়েছে, তা' থেকে প্রেরিত ধ্বনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়েছে। আমাদের কলিকাতায়ও যে বেতার গ্রাহক যন্ত্র আছে, চাঁদটি কলিকাতার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তার প্রেরিত ধ্বনি তাতেও ধরা পড়েছে।

পৃথিবীর মহাকাশে আরও কয়েকটি কৃত্রিম চাঁদ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা বৈজ্ঞানিকদের আছে।

মাছের সঙ্গে মিতালি

আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকামিনীকুমার সেনের ১০ বৎসর বয়স্কা কন্যা মিতু। করিমগঞ্জে তাদের পুকুরে আছে একটা বড় রুই মাছ। এই রুই মাছটির সঙ্গে মিতুর বড় ভাব। মিতুর ডাক শুনলেই মাছটি ঘাটের কাছে চলে আসে। ইঞ্চি খানেক জলের তলায় মিতু হাত রাখলে মাছটি তার হাতের কাছে এসে খেলা করে। মাছটি মিতুর হাত থেকে নানারকম খাবারও খায়—রসগোল্লা-পানতোয়াও বাদ পড়ে না!

সিংহ-গণনা

আফ্রিকার বাইরে একমাত্র ভারতের গির অরণ্যে (সৌরাষ্ট্র) সিংহ দেখতে পাওয়া যায়। গির অরণ্যে মোট কত সিংহ আছে, মাঝে মাঝে তা' গণনা করে দেখা হয়।

এই গণনা করা হয় নানা উপায়ে। এই বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের গোড়ার দিকে সিংহদের গায়ে দূর থেকে রং লাগিয়ে দিয়ে তাদের সংখ্যা গণনা করা হবে। গত বারের গণনায় জানা যায় যে, গির অরণ্যে ১৪১টি সিংহ এবং ১০২টি সিংহী আছে।

এস্. সি. মজুমদার কর্ত্তৃক দেব-প্রেস, ২৪ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
মুদ্রিত ও ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

টেলি : বিদ্যাসেবা | পোঃ বক্স : ১১৪৫০

জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও উন্নতির মূলভিত্তি

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস্ লিঃ

হেড অফিস :—৩২এ, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা—১

ফোন :—২২-১৫৩২, ২২-১৫৩৩, ২২-১৫৩৪ (তিন লাইন)

সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী কাগজ, বোর্ড, ছাপা কালি ইত্যাদি
ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করেন

ব্রাঞ্চ :—১৬৭ নং, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৪|৩৫, " " "
৬৪ নং, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ফোন নং : বড়বাজার, ৩৪-১০২০
মফস্বল ব্রাঞ্চ :—এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচি ও কটক